জয়োল্লাস

শ্রীঅনাদিনাথ মুখোপাধ্যায়

ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"চুঁচুড়া-বার্ত্তাবহ" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীধ্যানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
দ্বারা প্রকাশিত।

—দেড় টাকা—

মুদ্রাকর—শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীপতি প্রেস,
৭৮, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

—সূচী—

ভূমিকা

শ্রীমান্ অনাদি মুখোপাধ্যায়ের লেখা আমি পড়েছি। প'ড়ে ভালোও লেগেছে। কিন্তু ঐটুকু বল্‌লেই ভূমিকা লেখার কর্ত্তব্য শেষ হয় না।

দিনের আলো পরিস্ফূট হবার আগের উদয়-গোধূলি-রাগ মন এবং চোখ দুইকে বেশী আকৃষ্ট করে।

শ্রীমান্ অনাদির লেখায় উদয়-গোধূলির রক্ত-রাগ দেখেছি। তাঁর আকাশে নতুন আলোর আগমনী সঙ্গীত শুনেছি।......

এঁর ছোট গল্পগুলির বিশেষত্ব এই যে, এগুলি গল্পও হয়েছে এবং ছোটও হয়েছে। ভাষাও রসালো এবং জোরালো। এক-আধটু ত্রুটী-বিচ্যুতি যা আছে, তা হাত পাক্‌লে আপ্‌নি সেরে যাবে।

বাগ্‌দেবীর পূজা-দেউলে আর এক নবীন পূজারী এলেন তাঁর অর্ঘ্য নিবেদন করতে, আশা আছে—দেবী প্রসন্নচিত্তেই এ পূজা গ্রহণ করবেন। দেবী-মন্দিরের পুরোহিতদের কাছে শুধু তাঁর পরিচয় ক'রে দিয়েই আমি বিদায় নিচ্ছি।

আরো অনেক লেখার ছিল, সময় হ'ল না। রুদ্রের ডমরু আমায় ডাক দিয়েছে বাগ্দেবীর দেউলাঙ্গন থেকে। ইতি—

কলিকাতা
২১শে পৌষ
১৩৩৭ সাল।

নজরুল ইসলাম

—যেখানে বিনা-কৈফিয়তে সকল বোঝা নামিয়ে
দেওয়া যায়, সেই ভূ-স্বর্গ—মাতা-পিতৃ-চরণে
অগণিত নর-নারীর ব্যথার-বোঝা
নিয়ে হাজির হলুম।

উদাসী

মরণোল্লাস

বৎসর পাঁচ-ছয় 'ইন্‌টার্ণ' থাকিবার পর যখন মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিলাম তখন যুগ-প্রবাহ-ধারা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। স্বদেশী-যুগের রুদ্র নাচন একদিন যেভাবে দেশময় ভাবের জোয়ার বহাইয়া দিয়াছিল, আজ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম তাহা ভিন্নখাতে—স্বতন্ত্ররূপে চলিয়াছে। তখন 'বোমা-গুণ্ডা-বাঙ্গালী' বলিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রশংসা পাইতাম, কিন্তু ভ্রান্ত-পথে পরিচালিত হইয়া থাকিলেও এখন তাহাদেরই নিকট শ্রদ্ধা-ভয়-বিস্ময়-ভক্তির সংমিশ্রণ একটা আদব পাইতে লাগিলাম।

বঞ্চিত নরনারীর স্বাধিকার তাহাদের হাতে পুনরায় তুলিয়া দিতে পারিব ভাবিয়া তখন আনন্দে ভিতরের এবং বাহিরের সব দুঃখকে যেন ভুলিয়া গিয়াছিলাম কিন্তু বাড়ীতে ফিরিয়া রুগ্না বৃদ্ধা-মাতা, শীর্ণা স্ত্রী ও বুভুক্ষু শিশুগুলির প্রতি চাহিয়া পথের জীবন শেষ করিতে হইল,—ঘরের জীবনে মন দিলাম।

মরণোল্লাস

চাকুরীর জন্য বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই দ্বারে গিয়া পড়িলাম, কিন্তু পুলিশের নেক-নজরকে সকলেই ভয় করিল।

যাহাদের জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মীছাড়া সাজিয়াছিলাম, তাহারা আমার ত্যাগের মূল্য বুঝিল না।

দিন কয়েক পরে আমার সাংসারিক দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া আমার স্বর্গত পিতার বন্ধু, বড আদালতের সরকারী উকিল সত্যেন বাবু আমায় ডেকে বল্লেন, "তোমার অবস্থার কথা আমি বুঝ্তে পেরেছি। তোমাকে আমি কিছু কিছু সাহায্য করতে চাই, তুমি স্বেচ্ছায় তা নিতে পারবে ত?"

দান ভিক্ষার নামান্তর ভাবিয়া আমি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলাম। গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিলাম, "না, আমি তা নিতে পারব না।"

নিরন্নের বেদনা সত্যেনবাবুর প্রাণে সত্যই বাজিয়াছিল। তিনি আমার উপর জোর করিয়া বলিলেন, "জান, তুমি আমার বন্ধুপুত্র,—একরকম আত্মীয় বল্লেও চলে। আমার কাছে তোমার গাম্ভীর্য্য দেখান খাটে না।"

আমি বিনয় সহকারে কহিলাম, "সত্যেনবাবু, আমার গাম্ভীর্য্য —অভিমান বা অহঙ্কারের নয়, এ গম্ভীরতা,—বেদনায় মথিত হয়ে আপনা হ'তেই সৃষ্ট হয়েছে। আমি নিরর্থক আপনার কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারব না।"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার পর সত্যেনবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, কাজের মূল্য স্বরূপ তুমি তা নিতে পারবে ত ?"

আমি বলিলাম, "তা পারি।"

সত্যেনবাবু কহিলেন, "তাহলে কাল থেকে আমার ছেলেকে ঘণ্টাখানেক ক'রে পড়িয়ে যেও।"

আমি ঘাড় হেঁট করিয়া তাহাতে সম্মতি জানাইলাম।

(২)

ছেলে পড়ান অভ্যাসটা আমার কখনও ছিল না। কেমন করিয়া পড়াইব, কি পড়াইব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। মুক্ত-অন্তরীণের সহিত সরকারী উকিল-পুত্রের কখনো খাপ খাইতে পারে না জানিয়াও পেটের জ্বালায় পরদিন সত্যেনবাবুর বাটিতে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য যে, সেই ক্রীড়া চঞ্চল, হাস্যময়, দ্বাদশবর্ষীয় বিজয়কুমার প্রথম সাক্ষাতেই আমার সমস্ত মন অধিকার করিয়া লইল।

তার সুদর্শন চেহারা, সরল কণ্ঠস্বর, ছলনা-কপটতাহীন মৃদুভাব, স্বচ্ছন্দগতি দেখিয়া তখন বুঝিতে পারি নাই যে, এই জীবন্ত বালকের ভিতর কি আকাঙ্ক্ষা নিহিত ছিল। তাহার বেদনার পাত্র যে আমাদের অপেক্ষাও গভীর ও ভরপুর ছিল—তাহা তাহার টানা টানা চক্ষুদ্বয়েই লেখা ছিল, কিন্তু তখন তাহা পড়িতে পারি

নাই। বলিতে কি,—রাজনীতির সহস্র চাল চালিয়া আসিয়াও তাহাকে বুঝিবার ক্ষমতা তখনও আমার হয় নাই।

তাহাকে পড়িবার বইগুলি আনিতে বলিলাম। সে বইগুলি লইয়া আসিয়া একপাশে সরাইয়া রাখিয়া প্রথম হইতেই আমার সহিত আলাপ জমাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার ভিতরকার খবরগুলি জানিবার তাহার যেন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িল। কহিল, "মাষ্টারমশাই, আপনাকে পুলিশ এতদিন আটকে রেখেছিল কেন ?"

বিপদে পড়িলাম। কহিলাম, "তুমি ছেলেমানুষ, সে কথা এখন বুঝ্‌তে পার্‌বে না।"

কিন্তু সে ছাড়িবার পাত্র নয়। কহিল, "আপনি যদি বুঝিয়ে বলেন, আমি কেন বুঝতে পার্‌ব না ?"

চির-জ্যোৎস্না-বিরাজিত বালকহৃদয়ে আমাদের রণোল্লাসের ধুঁয়া ধরাইয়া দিলে তাহার শিক্ষায় বাধা পড়িতে পারে ভাবিয়া এবং সরকারী উকিলের পুত্রের নিকট রাজনৈতিক আলোচনা দোষনীয় এ নিজেরও সমূহ ক্ষতি বিবেচনায় একটু ধমক দিয়া কহিলাম, "আচ্ছা, সে আর একদিন বল্‌ব। আজ পড়া আরম্ভ কর।"

বিজয়কুমার পড়িতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু মনে হইল সে যেন অন্য কোন বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল।

(৩)

মাস দুই কাটিয়া গিয়াছে।

ইহার মধ্যে বিজয়কুমার শিক্ষায় কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা আমি ও সে নিজে ভিন্ন আর কেহই জানে না। এতদিন ধরিয়া সে আমাদের গুপ্ত-সমিতির কথা, দেশ-বিদেশ ভ্রমণের কথা, অন্তরীণের কথা, বঞ্চিত পরাধীন নর-নারীর কথাই কেবল শুনিয়া আসিয়াছে। দেশের কথা বলিতে বলিতে আমিও যেন আত্মহারা হইয়া যাইতাম ; দারিদ্র্যের তাড়নায় পড়াইতে আসিয়াছি—সে কথা আদৌ মনে থাকিত না।

বাটীর মধ্য হইতে জলখাইয়া ছুটিয়া আসিয়া বিজয়কুমার কহিল, "মাষ্টারমশাই,—মুস্কিল !"

আমি চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হল ?"

বিজয় কহিল, "বাবা এবার আমার পড়ার একজামিন্ নেবেন !"

আমার অস্থবাস্থ্য শুকাইয়া গেল। কহিলাম, "আজই নাকি ?"

বিজয় হাসিয়া বলিল, "আজ ভয় নেই, মাষ্টারমশাই, কাল করবেন বলেছেন।"

তাড়াতাড়ি বই খুলিয়া পড়িতে বলিলাম। বিজয় অগ্রাহ্য করিয়া কহিল, "বাবা আজ ত আর একজামিন্ করবেন না, সে কাল পড়া হবে এখন। আজকে সেই পুলিশে ধরার গল্পটা বলুন।"

পুত্রের পরীক্ষা লইতে যাইলেই আমার অক্ষমতা, অলসতা সবই সত্যেন বাবুর নিকট প্রকাশ হইয়া যাইবে। হয়ত—কেন,—নিশ্চয়ই তিনি আমাকে তাড়াইয়া দিবেন। তখন যে দুঃখে ছিলাম সেই দুঃখই আবার ফিরিয়া আসিবে। ভবিষ্যতের অন্নচিন্তার কথা মনে পড়িল। এতদিনের নিজের অবহেলার কথা ভুলিয়া আজিকার বিজয়ের অগ্রাহ্যের উপরই সব দোষ চাপাইলাম। সক্রোধে বিজয়ের কান ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া কহিলাম, "আজই তোমাকে সমস্ত বই পড়ে শেষ করতে হবে।"

তাহার চক্ষু, নাসিকা, গণ্ডদ্বয় অভিমানে আরক্ত হইয়া উঠিল। ব্যথিত করুণস্বরে কহিল, "আমাকে মারবেন না মাষ্টারমশাই,—আমার যে মা নেই।"

"মা নেই"—এই বেদনা মাখা কথাটী আমার আজন্ম বেদনার উপর আরো যেন ভার চাপাইয়া দিল। স্থির থাকিতে না পারিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবেগে বলিলাম, "ওরে, আজ সমগ্র মাতৃহারা দেশ আঘাত পেয়ে ঠিক তোরই মত 'মা নেই' বলে কাঁদছে। আমি মাতৃহারার গায়ে হাত তুলে ভুল করেছি। সে বেদনা যে কত দুর্ব্বিষহ তা মাতৃহারা দেশবাসী আজ হাড়ে-হাড়ে বুঝছে। তাই তারা তাদের মাকে ফিরে পাবার জন্যে এত করে খুঁজছে!

বিজয় হঠাৎ আমার আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া চমকিত হইয়া

জিজ্ঞাসা করিল, "হারাণ মাকে খুঁজ্‌লে কখনও ফিরে পাওয়া যায়?"

তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ধীরে ধীরে বলিলাম, "তা পাওয়া যায় বৈ কি।" মনে মনে ভাবিলাম,—"না পাওয়া গেলে মাতৃহারা দেশের আজ মাতৃ-সন্দর্শনের এত চেষ্টা কেন?

বিজয় সজল-নয়নে আগ্রহ সহকারে কহিল, "আমার মাকে তাহলে পাওয়া যেতে পারে?"

সহসা উত্তর দিতে পারিলাম না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিজয়কুমার পুনরায় ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বলুন না,—পাওয়া যায় কিনা?"

বলিলাম, "হা,—পাওয়া যায়।"

বিজয়ের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কহিল, "কেমন ক'রে? আমার মাকে আমি কখনও দেখিনি, আমার যখন একবৎসর বয়স তখন মা আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাঁকে দেখ্‌তে আমার ভয়ানক ইচ্ছে হয়।"

কঠিন সমস্যায় পড়িলাম। একটা উত্তর দিতে না পারিলে রেহাই নাই ভাবিয়া কহিলাম, "এখন কি ক'রে দেখবে। মানুষ যখন তার সব কাজ শেষ ক'রে এখান থেকে চলে যায় তখন মৃতজনের সঙ্গে দেখা হ'তে পারে।"

এতদিন পরে যেন পথ পাইয়া বিজয় আস্ফালন করিয়া কহিল,

"মর্‌লে দেখা পাওয়া যায়? তবে ত শিগ্‌গির শিগ্‌গির মর্‌লে আমিও শিগ্‌গির শিগ্‌গির মা'র কাছে যেতে পাব?"

মা'কে ফিরিয়া পাইবার আশায় একটা বালক মরণকে এমন মধুর করিয়া লইতে পারে ভাবিয়া আমার ভয় হইল। মায়ের আহ্বান যে পুত্রকে পাগল করিয়া দেয়, তাহা দেশের যৌবনকে দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু ক্ষুদ্র বালককেও যে উন্মাদ করিতে পারে তাহা ভাবি নাই। ভয়ে ভয়ে কহিলাম, "তা বলে আত্মহত্যা ক'রোনা যেন বিজয়। তার মত পাপ আর নেই। যখন স্বেচ্ছায় মৃত্যু হবে তখন মা'র কাছে যেও।"

এতক্ষণ সত্যেন বাবু পিছনে দাঁড়াইয়া আমাদের সমস্ত কথাবার্ত্তা যে শুনিতেছিলেন তাহা আমরা কেহই টের পাই নাই। হঠাৎ শিহরিয়া তাঁহার প্রতি চাহিতেই তিনি বজ্রকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি কি বিজয়কে এখানে প্রেত-লোক-তত্ত্ব শেখাতে এসেছ?"

তাঁহার সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "রোজই এইরকম গল্প হয় শুন্‌তে পাই,—বই বোধ হয় একদিনও খোলা হয়নি?"

আমার বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছিল। কোনক্রমে "আজ্ঞে,—হাঁ,—না" করিয়াই থামিয়া গেলাম।

তিনি আর বাগ্বিতণ্ডা না করিয়া নিরীহ বিজয়কুমারের সর্ব্বাঙ্গ প্রহারে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিজয়ের ত কোন দোষ নাই!—সে নির্দোষ। বুঝিলাম সত্যেনবাবু আমার প্রতি আক্রোশ বশতঃই পুত্রকে প্রহার করিতেছেন। আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, আসন্নমৃত্যুর কবল হইতে বিজয়কে বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে আগুলিয়া দাঁড়াইলাম।

সত্যেনবাবু ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বেশী কথা কহিতে পারিলেন না, রঙ্গুলি নির্দ্দেশে আমাকে বাহিরের দরজার প্রতি দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, "সরে যাও।"

সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইলে ক্রোধের উপশম হইতে পারে ভাবিয়া আমি বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

পরদিন মাতা-স্ত্রী-পুত্রের মুখ চাহিয়া পুনরায় সত্যেনবাবুর দ্বারে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া পড়ানটা বজায় রাখিবার জন্য যাইলাম। কিন্তু শুনিলাম বিজয়কুমার কাল হইতেই জ্বরে অচৈতন্য, এবং আমার মত শিক্ষক সত্যেনবাবু আর রাখিতে চাহেন না।

* * * * *

দিন আষ্টেক পরে সংবাদ পাইলাম যে বিজয়ের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন—বাঁচিবার আশা খুব কম।

অভিমান, অপমান লজ্জা, তিরস্কার সব ভুলিয়া বিজয়ের শয্যা-পার্শ্বে ছুটিয়া যাইলাম। দেখিলাম, ডাক্তারেরা জবাব দিয়া নিরাশ হইয়া বসিয়া আছেন।

আমাকে দেখিয়া বিজয় জড়িতকণ্ঠে কহিল, "দেখুন্ না, আমি আমি আর বাঁচতে চাইনা তবু এরা আমাকে বাঁচাবার জন্যে কত চেষ্টা কর্‌ছে। ওদেরকে বলে দিন না যে আমি আমার মার কাছে যাচ্ছি,—আমার মা ডাক্‌ছে।"

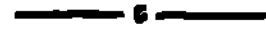
এই মর্ম্মন্তুদ কথা বলা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য তাহার কথা চাপা দিয়া বলিলাম, "তোমার কি কোন কষ্ট হচ্ছে বিজয়?"

মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়াইয়াও সে মুখে কাতরতার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। সীমাহীন আনন্দে সে মুখ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃতে ভরিয়া উঠিল। একমুখ হাসিয়া বিজয় কহিল, "মাষ্টারমশাই আপনিই ত বলেছিলেন মাকে দেখ্‌বার আকাঙ্ক্ষা সব কষ্টই চাপা দিয়ে দেয়। আমারও এ মরণে ত কোন কষ্ট নেই। এ মরণ যে আমার আনন্দের—উল্লাসের। এবার যে আমার মাকে আমি সত্যই দেখ্‌তে পাব।

এই ক্ষুদ্র বালকের মরণোল্লাস দেখিয়া আমাদের সেই গুপ্ত-সমিতির মরণোল্লাসের আস্ফালন মনে পড়িল, দেশ-জননীর চরণদর্শনের প্রতিজ্ঞা মনে পড়িল। সে মরণ বরণ করিয়াও ত আমরা মাকে পাই পাই; কেবল নির্য্যাতন ভোগ করিয়াই ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন বুঝিলাম যে হিংসাত্মক আসুরিকতা দ্বারা মাতৃপূজার অধিকারী হওয়া যায় না।

বিজয়কুমার আরও কি যেন বলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু আর মুখ খুলিল না। চিরজন্মের মত ধীরে ধীরে তাহার সেই বড় বড় চক্ষুর্দ্বয় মুদিত হইয়া গেল। অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি তেমনি জ্যোতির্ময় হাসিতে ভরিয়া রহিল। বিজয়কুমার বিজয়ী হইয়া চলিয়া গেল।

ক্রন্দনরোল উঠিল, কিন্তু আমি তাহাদের সহিত যোগ দিয়া কাঁদিতে পারিলাম না। ধীরে-ধীরে সেই হিম-শীতল দেহের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া এই সুন্দর, শুভ, সুখদায়ক, মহিম্ন মরণোল্লাসের চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিলাম।



মাতব্বরী

মুখ ত কারো আটকানো যায় না, পাড়ার লোকে পাঁচ কথা বলবে সে আর বেশী কথা কি।

কেউ বলে,—"এমন যে ঘট্‌বে তা আমি বহু পূর্ব্বেই জানতাম।"

কেউ বলে,—"দোষ কিন্তু দত্তখুড়োরই ; ওরকম সুন্দরী মেয়েকে কি পাঁচজনের চোখ থেকে আগ্‌লে রাখা যায়।"

—"আমি কিন্তু ভাই ওর প্রথম চাউনি দেখেই ধরে ফেলেছিলাম যে ও কখনই ভাল ঘরের মেয়ে হ'তে পারে না।"

—"আমিও তার বেহায়াপনা বেশ ভাল করেই পরখ করেছিলাম। ভদ্রলোকের মেয়ে, গেরস্তোর বউ যে এমন ঘোমটা খুলে আঁচল দুলিয়ে বেড়ায় তা' কখন জানতাম না।"

—"তাহলে সেদিন পূব্‌পাড়ায় দুটো অচেনা লোককে ত আমি ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।"

—"ওরে, সেই দু'বেটাই হবে, আমিও তাহলে ঠিক দেখেছি। দত্তদের গোয়ালঘরের পেছনে দু'বেটায় ফুস্‌ফুস্ কর্‌ছিল, আমায় দেখেই একেবারে দৌড়। যদি ধর্‌তে পারতাম্ তাহলে একবার—"

—"আরে, সহুরে মেয়ে আর পাঁচভাতারী একই কথা! 'দেশো' দত্ত মনে করেছিল, সহুরে মেয়ে বিয়ে করে আমীরওমরাও সেজে আমাদের তাক্ লাগিয়ে দেবে। এখন বাছাধন বোঝ, জাতও হারালে পেটও ভর্‌লো না।"

এই রকম কথা নিয়ে বারোয়ারীতলার খড়ের গাদায় দক্ষিণ-গাঁয়ের যুবকদের দৈনন্দিন আড্ডাটী বহুদিন নীরস ভাবে কাটানোর পর এ দু'দিন বেশ সরস ভাবেই জমেছে।

জম্‌বার কথাই ত। গাঁয়ের ভেতর থেকে নতুন সমথ বউ বেমালুম উধাও হয়ে গেল আর ছেলেরা সে বিষয়ে কি দুটো কথা কইতেও পাবে না? ভাল ঘরের মেয়ে যদি হ'ত, তা'হলে কি তার। এমনি ভবে বসে থাক্‌ত,—নিশ্চয়ই তদন্ত করে বা'র কর্‌তো।

দত্তখুড়ো ও তৎপুত্র 'দেশো' ওবফে দাশুরথি এ দু'দিন লজ্জায় বাড়ীর বাহির হয় নাই। পিতাপুত্রে দাওয়ায় বসিয়া কত আক্ষেপই না করিতেছে।

দত্ত বলেন,—"তুই যদি মার্‌ধর না করে বউটাকে ভাল করে বোঝাতিস্ তা হলে এমন কেলেঙ্কারীটা ঘট্‌তো না।"

—"মার্‌ধর আর এমন কি করেছিলাম, বাবা? মিষ্টিকথা কি আর বলিনি,—বলে বলে হায়রাণ হয়ে গেছি।"

—"তা জানি, তবু সহুরে মেয়ে,—পাড়াগাঁয়ের খাট্‌নি কি তাদের হঠাৎ সহ্য হয়?"

"সহুরে মেয়ে বলে কি শ্বশুরবাড়ী এসে কাজকর্ম্ম করবে না? বিবি সেজে বসে থাকবে! যাক্, গেছে যখন চুলোয় যাকগে। তুমি আজই তোমার বেয়ানকে চিঠি লিখে দাও—যেন ও মেয়ে এ বাড়ীতে আর না পাঠান হয়। পালিয়েছে যখন তখন বাপের বাড়ীতেই আজন্ম বাস করুক, আমি আবার বিয়ে করবো।"

—"আমি বলি, পালিয়েই যদি গিয়ে থাকে ত কা'রো সঙ্গে যেতে হবে ত? আর কোন্ সময়ই বা পালাল? গাঁয়ে এতগুলো লোক,—কা'রো কি নজরে পড়লো না?"

—"সহুরে মেয়ের কিছুই অসাধ্য নেই বাবা। তারা একলা মদ্দোর মত পৃথিবী ঘুরে আসে, আর সামান্য এই বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারবে না?"

অবশেষে নানাবিধ বিধি-ব্যবস্থার পর স্ত্রীত্যাগ এবং নূতন বিবাহের সঙ্কল্প-ই পিতাপুত্রে স্থির করিয়া ফেলিল।

কিন্তু সমাজ! তার যে আজ 'পোয়া বারো'—সে ছাড়িবার পাত্র নয় ত! পঞ্চায়েৎ বসিল, মাতব্বরও জুটিল অনেক।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর দত্তখুড়োকে ডাকাইয়া, স্বতন্ত্র স্থানে বসাইয়া জানান হইল,—"যে হেতু দত্ত, গ্রামের বন্ধুদের সহিত পরামর্শ না করিয়া সহরের মেয়েকে বধু করিয়া গৃহে আনিয়াছিল, এবং কন্যার পিতার নিকট হইতে অজস্র অর্থ যৌতুক-স্বরূপ পাইয়াও 'গ্রাম-ভাটী' ও বারোয়ারীর চাঁদা দেয় নাই, অধিকন্তু যেহেতু তাহার

পুত্রবধূ পরপুরুষের সহিত নিশীথে কুলটার ন্যায় পলায়ন করিয়াছে সেই হেতু দত্তবংশ অদ্য হইতে জাতি হারাইল এবং 'একঘরে' হইল।"

দিন কুড়ি পরের কথা।

'মেধো' বাউরী নূতন-পুকুরে জাল ফেলিতেছে,—জমিদার বাবুর বেহাই বাড়ী আজ মাছের তত্ত্ব পাঠাইবেন।

আড্ডার ছেলেরা সকলেই পুকুর পাড়ে জমা হয়েছে। মাতব্বরেরাও কোমরে হাত দিয়ে মাতব্বরী করতে লেগেছে,—ছোট বড় যা' হোক একটার প্রত্যাশায়।

বার পাঁচ ছয় জাল ফেলার পর এবার জাল বেশ ভারী ঠেকল। কিন্তু পচা দুর্গন্ধ বা'র হচ্ছে কেন?

ঘাটের উপর জাল তুলেই 'মেধো' চীৎকার করে বলে উঠ্লো,—"এ যে মানুষ গো।"

সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নাকে কাপড় দিয়া জাল ঘিরিয়া দাঁড়াইল। গলিত শবের বিকৃত অবস্থা দেখিয়া কেহই নির্ণয় করিতে পারিল না যে কা'র মৃত দেহ।

বহুক্ষণ পরে আড্ডার ছেলেদের মধ্য হইতে কে একজন অনিচ্ছাসত্ত্বে ও মৃদু স্বরে বলিয়া ফেলিল,—"এ যে 'দেশো'রই বউ দেখ্ছি।"

মাতব্বরেরা একে একে সেই স্থান হইতে নিঃশব্দে সরিয়া গেল।

মনোরমা

(১)

তিন বছরের খাজনা বাকীর দায়ে সুরেন হালদারের বাস্তুবাটী সরকারী ঢাক বাজাইয়া নিলাম হইয়া গেল। নায়েব মহাশয় বেনামায় তাহা ডাকিয়া লইলেন।

মহামায়া ধীরে ধীরে স্বামীকে কহিল, "ওগো, আজ যে মনোর বিয়ে। তার মুখ চেয়ে, বিপিনের মুখ চেয়ে একবার দেখলে না? তোমার মুখ দিয়ে কি একটা রা'ও বা'র হল না।"

সুরেন দরজার পাশে হাঁটু দুটো কপালে ঠেকাইয়া অধোবদনে বসিয়াছিল। মহামায়ার প্রতি মুখ তুলিয়া তাহার কথাগুলি চক্ষু দিয়া একবার গিলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। হাত বাড়াইয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত অস্ফুটে কহিল, "এব।"

মহামায়া স্বামীর হস্ত ধরিয়া উঠাইল। সুরেন বাটীর চতুর্দ্দিক একবার বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিল। নানাস্থান হইতে আগত চালে গোঁজা কতকালের পুরাতন ও বিবর্ণ পোষ্টকার্ডগুলি একে একে দেখিয়া পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিল। সদ্য-কর্ত্তিত ভিয়ানের চুল্লির প্রতি একবার চাহিল। শয়ন গৃহের দ্বারের উপর একটা

কাঁচভাঙ্গা অস্পষ্ট সত্যনারায়ণের ছবি ঝুলিতেছিল, সুরেন করজোড়ে তাহাকে প্রণাম করিল। তারপর বিপিন ও মনোরমার হাত ধরিয়া ভাঙ্গা গলায় কহিল, "চল।"

বিপিন ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "কোথায়?" এ কথার উত্তর সুরেন খুঁজিয়া পাইল না, সে নিজেই জানেনা কোথায় যাইতে হইবে। কহিল, "তাতো জানিনা।"

মহামায়া স্বামীর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আজকের দিনটা যাহোক করে থাক, মনোর বিয়েটা এইখানে শেষ হয়ে যাক্, তারপর কাল মনোর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বা'র হয়ে যাব।"

সুরেন হালদারের চোখ জলে ভরিয়া আসিল, দীর্ঘ উত্তর দিতে পারিল না। শুধু কহিল, "না, পরের বাড়ী।"

"তবে জমিদার বাড়ী গিয়ে এর কোন একটা বিহিত করবে চল। একটা দিনের জন্য তাঁরা কি দয়া করবেন না?"

সুরেন সজল চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "কা'রো কাছে যাবনা, সব পিশাচ,—সব শয়তান,—জগতটা শয়তানীতে ভরা, —ভগবানও শয়তানের গোলাম!" বলিতে বলিতে সকলকে লইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

ওপাড়ার বিধবা বামুনদিদি অন্যান্য মেয়েদের লইয়া আনাজ কুটিতে আসিয়াছিল, ধীরে ধীরে বঁটীটি কাত করিয়া রাখিয়া

কহিল, "যার তিন বছরের খাজনা বাকী, তার মেয়ের বিয়েতে এত ধুম কেন বাপু ?" তারপর দু'টো ফুলকপি আঁচল চাপা দিয়া লইয়া নিঃশব্দে খিড়কী দিয়া বাহির হইয়া গেল।

বরপক্ষেরা মধ্যপথে খবর পাইয়া বর ফিরাইয়া লইয়া গেল।

নায়েবের লাঠিয়ালের দল সহজেই বাটীর দখল পাইল, জোর জবরদস্তির আদৌ প্রয়োজন হইল না।

(২)

ফুলের জীবন হরণ করিয়া বৃন্তচ্যুত করিয়া দিলেও তাহার নিস্তার নাই—কুড়াইয়া পুনরায় মালায় গাঁথিবার চেষ্টা করা হয়। মনোরমা প্রত্যহ সন্ধ্যায় পুষ্করিণীতে জল লইতে আসে। নিযুক্ত লোকমুখে সন্ধান পাইয়া স্বয়ং নায়েব মহাশয় তালপুকুরের বাঁধান ঘাটে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রায়ান্ধকারে দূর হইতে মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া মনোরমা একবার থমকাইয়া দাঁড়াইল। তারপর গায়ের কাপড় ভাল করিয়া গোছাইয়া লইয়া পুনরায় ঘাট অভিমুখে গেল।

"এই যে মনো।"

মনোরমা নায়েব মহাশয়ের আপাদ-মস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "নায়েব মশাই, তুচ্ছ স্বার্থের জন্য মানুষ মানুষকে এতটা পীড়ন করতে পারে! দুর্ব্বলকে দলন করবার জন্যই কি ভগবান ঐশ্বর্য্যশালীদের ক্ষমতা দিয়েছেন ?"

নায়েব রসিকতা করিয়া কহিলেন, "শ্মশানে শুয়ে তোদের এখনও যে আস্ফালন কমেনি দেখ্‌ছি !"

মনোরমা কহিল, "সত্যকথা বল্‌তে কি কা'রো বাধা আছে ?"

"যাক্, এখন আছিস্ কোথায় তোরা ?"

মনোরমা অধোবদনে কহিল, "আপাততঃ রামতারণ জেঠাদের বাড়ীতে ,—তারপর দাদার একটা চাকরী ঠিক হ'য়ে গেলে আমরা কল্‌কাতায় গিয়ে থাক্‌বো।"

নায়েব মহাশয় বদন বিকৃত করিয়া কহিলেন, "কি বল্‌লি ?—রাম তারণ বাঁড়ুয্যের বাড়ী ?" তারপর অধরে দন্ত চাপিয়া রামতারণ বাঁড়ুজোর উদ্দেশে কহিলেন, "হারামজাদা—পাজী বেটা,—জলে বাস করে কুমীরকে ভয় কর না ?"

বস্তুতঃ রামতারণ বাঁড়ুয্যের কোন দোষ ছিল না। সুরেন হালদার জোর করিয়া সপরিবারে তথায় আশ্রয় লইয়াছে। তাই মনোরমা কহিল, "তাঁদের কোন দোষ নেই নায়েব মশাই।"

যে কার্য্য সাধিতে আসা, কথায় কথায় তাহা হইতে বহুদূরে সরিয়া যাওয়া হইতেছে দেখিয়া, বর্ত্তমানে দোষ-গুণের বিচার ত্যাগ করিয়া নায়েব মহাশয় মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা মনো, সাধ ক'রে এ কষ্ট ভোগ কর্‌তে তোদের ইচ্ছে হয় ?"

"পরিত্রাণের উপায়ও ত কিছু দেখিনা নায়েব মশাই।"

"উপায় যথেষ্ট আছে , আমার কথামত যদি তোরা চল্‌তিস্,

তাহলে আজ এ দুঃখ তো তোদের ভোগ করতে হ'ত না,—রাজার হালে থাকতে পেতিস্।

মনোরমা উচ্চকণ্ঠে কহিল, "থাকতে পেতাম সত্য, কিন্তু ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, সে সৌভাগ্য যেন কখনও না হয়।"

"ভাঙ্‌বি তবু মচ্‌কাবি না, কি বল্? খেতে না পেয়ে সব-গুলো একসঙ্গে জড়িয়ে মর্‌বি, তবু স্বেচ্ছায় দিতে চাইলেও হাত পাত্‌বি না।"

"ওতো স্বেচ্ছার দান নয় নায়েব মশাই, ও যে স্বার্থের দান, তা'ছাড়া দানে কখনও কা'রো দুঃখ ঘোচে না। মানুষকে সুখ দিতে ঐশ্বর্য্যের ক্ষমতা নেই, সুখে থাকবার ক্ষমতা মানুষকে করে নিতে হয়।"

উপদেশ গ্রহণ করিতে নায়েব মহাশয় এ স্থানে আসেন নাই। যে কামনা তাঁহার মনোমধ্যে অহরহঃ জ্বলিতেছে তাহাকে শান্ত করাই তাঁহার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। তাই ভ্রূ-দ্বয় উপরে উঠাইয়া নায়েব মহাশয় কহিলেন, "এখনও ভাল কথা বল্‌ছি বুঝে চল, নইলে—"

"নইলে বাকী আরও কি আছে, নায়েব মশাই।"

নায়েব মহাশয় নরম গলায় কহিলেন, "মনো, শোন,—তোকে আমি বড় ভালবাসি, তুই যদি নিজে মত করিস্, কা'রো সাধ্য নেই এতে বাধা দেয়। তা' ছাড়া আমি তো বলেই দিয়েছি,'তোর

বাপ যদি এতে রাজী হয়, আমি ন'পাড়ার দশ বিঘে জমী তোদের নামে লিখে দেবো।"

"দশ বিঘের দরকার নেই নায়েব মশাই, এখন আমরা যে না খেয়ে মরছি তার একটা বিহিত করতে পারেন?"

"সব পারি, কিন্তু রাজি হ'বি বল্?"

"যদি রাজি না হই তাহলে পারেন না? আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের মতন দশটা পরিবারকে ত প্রতিপালন করতে পারেন!"

"দশটা ছেড়ে বিশটা পারি, যদি আমার বুকটাকে তুই জুড়িয়ে দিতে পারিস্।"

"তা ভিন্ন নয়?"

নায়েব মশাই ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন,—"না।"

সংসার এমনই কুটীল,—হাতে জিনিষ না পাইলে কখন-ই মূল্য দিতে চায় না। নিঃস্বার্থে দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম, মমতা প্রদর্শনকে মানুষ অপব্যয় বলিয়াই মনে করে। ভগবান যাহাদিগকে নিরুপায় করিয়া, অক্ষম করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন, তাহাদিগকে চিরকাল সহ্য করিয়াই যাইতে হইবে,—একটা মুখোমুখি কথা বলিবারও তাহাদের অধিকার নাই! আজ মনোরমার মাতা-পিতা-ভ্রাতা যদি সমগ্র গ্রামবাসীর চক্ষুর সম্মুখে পড়িয়া অনাহারে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে, তথাপি নায়েবের ভয়ে হয়ত কেহই এক ফোঁটা মুখে জল দিতেও অগ্রসর হইবে না! দুর্ব্বলের ন্যায্য প্রত্যুত্তর ক্ষমতাবানের

নিকট অগ্রাহ্য এবং দোষনীয় বলিয়া মনোরমা আর কথা কহিল না, বুকের জ্বালা বুকে চাপিয়াই চুপ করিয়া রহিল।

"কি চুপ ক'রে রইলি যে? দুটো মিষ্টি কথাও কি আমার সঙ্গে কইতে নেই?" বলিয়া নায়েব অগ্রসর হইয়া মনোরমার অঞ্চল ধরিবার উপক্রম করিতেই মনোরমা ঘড়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলায়ন করিল।"

সেইদিন হইতে মনোরমা আর জল তুলিতে আসিল না।

(৩)

স্কন্ধের বোঝা যত বেশীক্ষণ থাকে ততই ভার বোধ হয়।

রামতারণ বাঁড়ুয্যেকে গৃহ-মধ্যে ডাকিয়া গৃহিণী কহিল, "বলি, পাপের বোঝা বিদেয় করবে কবে? আপদ ঢুকলো তো আর যে নড়্তে চায় না!"

"আশ্রয়হীনকে চট্‌করে 'যাও' বলি বা কেমন করে? শুন্‌লুম, বিপিন শীগ্‌গীরই কল্‌কাতায় চাকরী করতে যাচ্ছে; তাদের নিজেদেরও তো একটা মান-অপমান জ্ঞান আছে। একটা সংস্থান হয়ে গেলে পর ওরা আর কি এখানে থাকতে চাইবে?—আপনা হইতেই চলে যাবে।"

গৃহিণী গাম্ভীর্য্য সহকারে থামিয়া থামিয়া কহিল, "অরুচিতে অম্বল আর শীতে কম্বল কেউ কি সহজে ছাড়ে? আমি এত

অসৈরণ সইতে পারবো না।" তারপর কর্ত্তার মুখের নিকট হাত নাড়িয়া কিঞ্চিৎ রুক্ষ উচ্চস্বরে কহিল, "তোমার কি বলনা, পুরুষ মানুষ,—তোমায় ত আর কিছু শুনতে হয় না, পাঁচ জনের পাঁচ কথা শুনতে শুনতে আমার যে কান পচে উঠ্‌লো। তার উপর আশ্রয় দেওয়া তো নয়,—নিজের বিপদ নিজে টেনে আনা।"

বিনা পরিশ্রমে নিরন্নের মুখে অন্ন উঠা লোকচক্ষু সহ্য করিতে পারে না,—গাত্রদাহ উপস্থিত হইবে-ই। বারো বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া রাধারাণী কলিকাতার হাড়কাটা গলিতে কিছুদিন বাস করিবার পর নবদ্বীপ হইতে 'ভেক' লইয়া পুনরায় গ্রামে ফিরিয়াছে। সে এখন গ্রামের সকলেরই—'বোষ্টম-মাসী'। বাঁড়ুয্যে গৃহিণী তাহারই নিকট হইতে খবর পাইয়াছে,—মনোরমা জল আনিবার ছলে প্রত্যহ সন্ধ্যায় নায়েবের কাছারীতে যাতায়াত করে। এরূপ কুলটাকে গৃহস্থ সংসারে স্থান দেওয়ায় গ্রামের লোকেরা কেহই বাঁড়ুয্যে বাড়ীর জল স্পর্শ করিবে না,—একথাও বলিয়াছে।

রামতারণ কিয়ৎক্ষণ আপন পদদ্বয়ের প্রতি নিস্তব্ধ ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিবার পর মুখ তুলিয়া কহিল, "বিপদের আর এখন বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। নায়েব মশাই—বিচক্ষণ, ন্যায়বান লোক,—তিনি কি কখনও কা'রো দুঃখ কষ্ট সহ্য কর্‌তে পারেন। আমাকে গোপনে ডেকে তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন, ওদের যেন বেশ যত্ন করে রাখা হয়।" নায়েব মশাই রামতারণকে একথা বলিয়াছিলেন

সত্য কিন্তু কেবল স্বার্থোদ্দেশে,—দূর গমনে মনোরমা হস্তান্তরিত হইবার ভয়ে।

গৃহিণী অধর উল্টাইয়া তাচ্ছিল্য ভাবে কহিল, "নায়েব কি তাদের খোরাকের জন্য দশ বিঘে জমী লিখে দিয়েছে ?"

"না দিলেও নায়েবকে সন্তুষ্ট রাখাও যে আমাদের বিশেষ দরকার।"

গৃহিণী কৃত্রিম ক্রন্দনের সুরে কহিল, "বেশ, তবে ওদের নিয়েই থাক, আমি কালই গোবিন্দপুর চলে যাব।" বলিয়া অভিমানাহতা রন্ধন গৃহে চলিয়া গেল।

বৈকালে বোষ্টম মাসী রসকলি কাটিতে কাটিতে মহামায়ার নিকট আসিয়া বসিল। বাঁড়ুয্যে গৃহিণী তখনও পাড়া বেড়াইয়া ফিরিয়া আসে নাই। মহামায়া ত্রস্তে একখানি কাষ্ঠাসন অগ্রসর করিয়া দিয়া বোষ্টম-মাসীকে বসিতে অনুরোধ করিল। বোষ্টম-মাসী বাধা দিয়া কহিল, "থাক্, থাক্ মহামায়া, আমি বসবার জন্যে আসিনি।"

গৃহচ্যুত হওয়া অবধি নিঃসঙ্গ থাকিয়া আজ বোষ্টম-মাসীর অযাচিত সম্ভাষণে মহামায়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিল। 'বিষ-কুম্ভং পয়োমুখম্'—বোষ্টম-মাসীর স্বরূপ পূর্ব্ব হইতে জানিয়াও মহামায়ার মন তাহার প্রতি কুভাব গ্রহণ করিতে পারিল না। বোষ্টম-মাসী একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া কহিল, "আহা

বাছা, তোদের দুঃখ দেখে অবধি আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে। এখনও যে তোরা এ বাড়ীতে কি করে আছিস্, আমি তাই ভাবি!"

"কেন মাসী, এখানে আমাদের তো কোন কষ্ট হয়নি। ভগবানের কৃপায় বাঁড়ুয্যে মশাই ছিলেন তাই চারটিতে যা' হোক ক'রে মাথা গুঁজে থাক্‌তে পেয়েছি, নইলে কি অবস্থা হ'ত বল দেখি? গাঁয়ের লোক ত মজা দেখতেই আছে, না খেয়ে পথে পড়ে মরে থাক্‌লেও কেউ ফিরে তাকাতো না।"

বোষ্টম-মাসী নাক মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, "কিন্তু বাছা তোমাদের বাঁড়ুয্যে গিন্নিও কম নয়। পথের লোক তবু পদে আছে, তাদের মুখে আর কাজে ভেদ নেই। কিন্তু এরকম মুখে ভালবাসা দেখিয়ে ভেতরে বিষের ছুরি কেউ চাগাতে পারে না বাবা। —ছি, ছি।"

"কৈ, বাঁড়ুয্যে দিদি তো তেমন নয় মাসী!"

"ওঃ আমার পোড়া কপাল! তোরা লোক চিন্‌বি,—তাহলেই হয়েছে! পাকা ফল খেতে মিষ্টি বটে, কিন্তু তাতেই পোকা ধরে।"

"কেন বাঁড়ুযো দিদি কি কিছু বলেছে?"

দু'একটা ঢোঁক গিলিয়া 'হাঁ', 'না' করিবার পর বোষ্টম-মাসী কহিল, "বৈরেগিনী মানুষ হয়ে, মনে করি কারো কথায় থাকবো

না, কিন্তু বাছা, মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিতা হ'য়ে তাঁর জীবের দুঃখ কি চোখে দেখে থাকৃতে পারা যায় ?"

হায়, শ্রীচৈতন্য! তোমার জীব-প্রেম-প্লাবন আরও কতদূর পৌঁছিবে!

মহামায়া উৎসুক নয়নে এই ভূমিকার সার অংশটুকু জানিবার জন্য বোষ্টম-মাসীর প্রতি চাহিয়া রহিল। রাধারাণী কহিতে লাগিল "বাঁড়ুয্যে কর্ত্তা বাছা, তেমন নয়, গিন্নিই কর্ত্তাকে ডেকে বল্‌লে, —'যদি সুবেন হালদারদের না তাড়ান হয় তো সে জন্মের মত বাপের বাড়ী চলে যাবে।' মরতে মর্, যত কথা আমার কানেই পৌঁছয়! তোদের না জানিয়েও থাকৃতে পারলাম না। দেখিস্ বাছা, আমার নাম্-টাম্ যেন করিস্‌নে।" এমন সময় বাঁড়ুয্যে গৃহিনী একটী ছাঁচি কুমড়া ক্রোড়ে লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিল।

দূর হইতে গৃহিণীকে দেখিয়াই বোষ্টম-মাসী কৃত্রিম হাসির অভিনয় করিয়া কহিল, "এই যে মা-লক্ষ্মী আমার!—তোমার জন্যেই বসে আছি। হাতে ওটা কি?—কুমড়ো বুঝি?—ঘোষেদের মাচার,—নয়? তা বেশ, বড়ি দেওয়া হচ্ছে কবে?"

"আমার কথা আর বল কেন! লোকের বাড়ী গেলে কেউ কি আর ছাড়তে চায়? চল, এক ফালি কুমড়ো নেবে চল।" বলিয়া বোষ্টম মাসীকে ডাকিয়া বাঁড়ুয্যে গৃহিণী রন্ধন গৃহ মধ্যে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর সুরেন হালদার স্ত্রীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রামতারণ বাঁড়ুযোর নিকট যাইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "দাদা, তোমার সংসারে অশান্তি সৃষ্টি ক'রে আমি এখানে থাকৃতে চাই না, আমাকে বিদায় দাও।"

রামতারণ বজ্রাহত হইয়া কহিল, "কেন,—কেন সুরেন, কোথায় যাবে ?"

সুরেন হালদার উত্তর দিতে পারিল না ; বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। রামতারণ অনুমানে কতকটা কারণ বুঝিয়া লইল। তারপর কিছুক্ষণ অধোবদনে থাকিবার পর কহিল, "সুরেন, গ্রাম সম্পর্কে ভাই হলেও তুমি এখন আমার অতিথি। অতিথির বেশে দেবতারাও ছলনা ক'রে গৃহস্থের আশ্রয় নেয়,—মানুষে তা জান্‌তে পারে না। ভগবানের আদেশ হ'লেও আমি তোমাদের তাড়াতে পারবো না।"

(৪)

বিক্ষিপ্ত মন লইয়া মানুষ কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন করিতে পারে না। কলিকাতায় যাইয়া বিপিন দিন কতক অনাহারে অনিদ্রায় সওদাগরী অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরিল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে কোন দিনই তাহার সাহসে কুলাইল না। রাত্রে ফুট্‌পাতে কিম্বা কোন পার্কে যখনই শয়ন করিতে যাইত, তখনই মাতা-পিতার

ব্যথিত মুখ তাহার নয়ন সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। অসীম চিন্তা তাহাকে একটু বিশ্রামেরও সুযোগ দিত না। বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে সে আবার দোকানে-দোকানে, গৃহস্থের দ্বারে-দ্বারে চাক্‌রীর আশায় ছুটিয়া বেড়াইত। এমনি করিয়া একদিন সে পথিমধ্যে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়া অনর্গল রক্তবমন করিতে করিতে এম্বুলেন্সের মোটরেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

গ্রামের মধ্য-ইংরাজী স্কুল হইতে 'বঙ্গবাসী' আনিয়া রামতারণ পড়িয়া জানাইয়া দিল,—'বিপিনের মৃত্যু ঘটিয়াছে।'

সুরেন হালদার, মহামায়া বা মনোরমা কেহই কাঁদিল না, তাহারা জানে,—মরিবার জন্যই বিপিনকে কলিকাতায় পাঠান হইয়াছিল।

মনোরমা কহিল, "মা, আমি কল্‌কাতায় যাব।"

মহামায়া কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "কেন মা ?"

"চাক্‌রীর জন্যে।"

সুরেন হালদার ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তুই মেয়েছেলে, কোথায় চাক্‌রী পাবি মা ?"

মনোরমা ধীর গম্ভীর স্বরে কহিল, "মেয়েরাও তো কল্‌কাতায় চাক্‌রী করে।"

সুরেন হালদার কহিল, "তারা লেখা-পড়া জানা মেয়ে, - লেখা-পড়ার-ই চাক্‌রী করে।"

"তা হোক, লেখাপড়া না জানা যে চাক্‌রী আছে, তাই আমি খুঁজে নেব।"

কন্যার পুরুষোচিত উক্তিতে মহামায়া ভীতা হইয়া কহিল, "তুই যে পাড়াগেঁয়ে গেরোস্তর মেয়ে,—একলা তোকে কেমন ক'রে ছেড়ে দি বল?"

মনোরমা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া কহিল, "পার না? দাদাকে কেমন ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলে? সেও ত তোমার পেটের ছেলে, আমিও তো তাই! দাদা যখন ম'রে গেছে, তখন আমাকেই তোমরা বিপিন বলে ভেবে নিও।"

"কিন্তু তুই যে এখন বড় হয়েছিস্ মা।"

মনোরমা মুখে কারুণ্যের রেখা টানিয়া কহিল, "বড় হয়েছি বলেই তো আর তোমাদের অনাহার-ক্লিষ্ট মুখ সহ্য করতে পারছি না।"

এমন সময় বোষ্টম-মাসী আসিয়া কহিল, "কথা-ই তো, সেয়ানা মেয়ে,—বাপ্-মার কষ্ট কি চোখে দেখতে পারে? আহা, ওর দ্বারাই তোমাদের দুঃখু ঘুচ্‌বে। কল্‌কাতায় আবার চাক্‌রীর অভাব! সেখানকার ধুলো-মুঠো কুড়োলে সোনামুঠো হ'য়ে যায়। কিছু ভাবিস্‌নে মহামায়া, আমি মনোকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। সেখানকার বড় বড় বাবুদের সঙ্গে আমার চেনা আছে।"

রাধারাণীর অযাচিত সহানুভূতিতে মহামায়া দুর্ভেদ্য অন্ধকার মাঝে যেন একটু আলোক দেখিতে পাইল, কহিল, "জানতো মাসী,

ও নাছোড়বান্দা মেয়ে ; যা বল্‌বে তা' না ক'রে তো আর ছাড়্‌বে না। তবু তুমি যদি যাও, আমি অনেকটা ভরসা পাব।"

"ও যদি যেতেই চায়, আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে বৈকি। অচেনা জায়গায় একলা গিয়ে থাক্‌বে কোথা? যতই যাই হোক, গাঁয়ের মেয়ে, আমারো দেখা তো উচিত?"

মহামায়া কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা মাসী, কল্‌কাতায় মনোর কি কাজ হ'তে পারে?"

"ভদ্দোর ঘরের মেয়ে ভদ্দোর কাজ কর্‌বে। বড় বড় বাবুদের বাড়ীতে কাজের ছড়াছড়ি. এমন মেয়ে পেলে সব বর্তে যাবে। অন্দরে বসে কুটনো কুটবে, বাঁটনা বাঁটবে, ভাঁড়ার দেখ্‌বে,—পুরুষের সেখানে সম্পর্কও নেই।"

অপরিচিত স্থানে বয়স্থা কন্যাকে একাকী ছাড়িয়া দেওয়ার পরিবর্ত্তে বোষ্টম-মাসীর হেপাজতকে মহামায়া অনেকটা নিরাপদ জ্ঞান করিল।

কলিকাতায় আসিয়া রাধারাণী আপনার বেশ-ভূষা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিল। তারপর মনোরমাকে সঙ্গে লইয়া একটা পরিচিত বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "বাড়ীউলী মাসী কোথায় গো?"

দ্বিতলের একটা জানালা হইতে জনৈকা প্রৌঢ়া রমণী মুখ বাড়াইয়া কহিল, "ওমা রাধি যে লো! আয়,—আয়—"

বাড়ীউলী মাসীর ঘরে প্রবেশ করিয়া মনোরমা দেখিল—গৃহটী আসবাবে পরিপূর্ণ। খাটের উপর একটী শুভ্র পরিষ্কার বিছানা এবং মেজেতে শুভ্র না হইলেও পরিষ্কার করিয়া আরও একটী বিছানা পাতা রহিয়াছে। মনোরমা পাশাপাশি দুইটী বিছানার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল না। ঘরের কোনে কলিকা সমেত একটী গড়্গড়া বসান ছিল। মনোরমা তাহা দেখিয়া অনুমান করিয়া লইল যে বাড়ীউলী মাসী তা'হলে বিধবা নয়,—বাড়ীও'লা মেসো বলিয়া একজন নিশ্চয়ই আছে! প্রাচীর গাত্রে নানাবিধ উলঙ্গ রমণীর ছবি টাঙ্গান, তন্মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গেরও একখানি ছবি শোভা পাইতেছে।

মনোরমাকে গৃহমধ্যে বসাইয়া বাহিরে বাড়ীউলী মাসীর সহিত রাধারাণী কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিল, মনোরমা তাহা শুনিতে পাইল না। তারপর রাধারাণী মনোরমার কাছে আসিয়া কহিল, "তুই এইখানে থাক, আমি একটু ঘুরে আসি। এর মধ্যে যদি কোন দরকার হয় ত বাড়ীউলি মাসীকে জানাস্।"

পল্লী-বালিকা মনোরমা ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিল না যে সে কোথায় আসিয়া পৌছিয়াছে। হতবুদ্ধির ন্যায় কহিল, "এখুনি ফিরবে তো?"

"ভাব্বার কিছু নেই,—শীগ্গিরই ফিরে আসছি।" বলিয়া রাধারাণী চলিয়া গেল, কিন্তু আর ফিরিল না।

* * * * *

মরণোল্লাস

মাস দুই পরে একদিন সন্ধ্যায় মনোরমা ঢাকাই শাড়ী পরিয়া, পাতা কাটিয়া চুল বাঁধিয়া, মুখে পাউডার মাখিয়া, আপাদ-মস্তক কেমিকেল স্বর্ণের অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া, হাড়কাটা গলির একটা দ্বারে দাঁড়াইয়া মাতাপিতার ভরণ-পোষণের অর্থের অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় জনৈক ভদ্রলোক আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জায়গা হবে ?"

প্রথম দর্শনেই মনোরমা আগন্তুককে চিনিয়া লইল, কিন্তু ভদ্রলোক মনোরমাকে চিনিতে পারিলেন না। মনোরমা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আপন ঘরে লইয়া গেল।

রাত্রি দ্বি-প্রহর পর্য্যন্ত বোতলের পর বোতল 'হুইস্কি' উড়িয়া গেল, কিন্তু মনোরমা একবিন্দুও স্পর্শ করিল না। আরক্ত শিবনেত্র ভদ্রলোক মনোরমাকে আপন পার্শ্বে আসিয়া বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, মনোরমা কটাক্ষপাত করিয়া দূরে সরিয়া গেল। ভদ্রলোক একবার ক্রুদ্ধ হইয়া মনোরমাকে গালাগালি করিলেন, পরক্ষণেই করজোড়ে মিনতি করিয়া জড়িত কণ্ঠে কহিলেন, "দয়াময়ী, নির্দয়া হ'য়ো না,—দয়া কর। তুমি না দয়া কর্‌লে এ ছার জীবন আর আমি রাখ্‌বো না।"

"কোন্ দুঃখে ?"

"আমি তোমায় বড় ভাল বেসেছি—"

"এই একদিনে,—ক'ঘণ্টার মধ্যে এত ভালবেসে ফেল্লেন।"

"হাঁ, সত্যি বল্‌ছি,—মাইরি বল্‌ছি আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে শুধু একটীবার ক'রে রোজ আমায় দেখা দিও, আমি আর কিছু চাইনা,—একবার ক'রে শুধু চোখের দেখা—"বলিয়া ভদ্রলোক পকেট হইতে পাঁচ হাজার টাকার একতাড়া নোট, ঘড়ির চেন, বোতাম, আংটী সমস্ত খুলিয়া মনোরমার সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

মনোরমা একবার পাগলের হাসি হাসিল, ভদ্রলোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। মনোরমা গম্ভীর হইয়া কহিতে লাগিল, "নায়েব মশাই, জিনিষ হাতে না পেয়ে তো আপনি কখনও মূল্য দিতে চান্ নি!—তবে আজ অনিশ্চয়তার মাঝে স্বেচ্ছায় সর্ব্বস্ব দান কর্‌তে বসেছেন যে! এ টাকা আপনি ফিরিয়ে নিন্,—এখন আর আমার কোন দরকার নেই। এ টাকা আর একদিন দিলে কিন্তু তার পরিবর্ত্তে একটু সহানুভূতি পেলেও একটা সংসার এমন করে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতোনা,—একটা জীবন অকালে নষ্ট হ'তো না,—আমারও এ দশা কখন ঘটতো না। আমায় বোধ হয় এখন চিন্‌তে পেরেছেন?—আমি সেই মনোরমা!"

পৌষ-কালী

পাঁচ ছেলের বাপ পাঁচকড়ি চাটুজ্যে পরস্ত্রীর প্রতি অবৈধ অত্যাচারের অভিযোগ হতে খালাস পেয়ে যখন তিনমাস পরে মকদ্দমা মিটিয়ে সহর থেকে গ্রামে ফিরে এল, তখন ব্রজসুন্দরী হাঁপ ছেড়ে, চোখের জলে বুক ভিজিয়ে বল্‌লে, "আঃ বাঁচলুম। পাড়ার নাচ বেটা-বেটীর জ্বালায় গাঁয়ে তেষ্ঠান দায় হয়ে উঠেছিল। মরণ আর কি। দেবতার চরিত্তোরে কলঙ্ক দেওয়া ত অমনি নয়,—মুখে সব পোকা পড়বে! আমি যদি সতী-সাবিত্তিরি হই,—আমার কথা ফল্‌বেই ফল্‌বে,—দেখে নিও!" তারপর স্বামীর হাত ধরিয়া ঘরে উঠাইয়া কহিল, "এত করে মা কালীর মানত কখনও কি বৃথা যায়। আমি জান্‌তুম,—মা মুখ তুলে চাইবেন-ই-চাইবেন, তিনি ভিন্ন আমাদের আর কে আছে? ওরে হারাণী, কোথা গেলি?—শীগ্‌গির দাও ময়রার দোকান থেকে নাচ-পয়সার বাতাসা এনে তুলসী-তলায় হরির-নোট দিয়ে দে!"

পাঁচকড়ি চাটুজ্যে ৩৫ বছর বয়সের মধ্যে এরূপ মামলায় অনেকবার-ই জড়িত হয়েছে, আজ নূতন নয়। ছ' বছর আগে সরকারী চাকরী থেকে বরখাস্ত হয়ে গ্রামের মধ্যে-ই সে হাড়ি-

বাগদীদের নিয়ে শূয়োরের ব্যবসা করে বেশ দু'পয়সা করেছে। তিনটে পাজা পুড়িয়ে গাঁয়ের বুকের উপর তার যে পাকা ইমারত উঠেছে, আশে-পাশের দশটা গাঁ খুঁজলেও তেমনটী আর পাওয়া যাবে না।

ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে শূকরের ব্যবসা করার জন্য দিন কতক বিদ্যাবিনোদ খুড়ো অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে পাঁচকড়িকে 'একঘরে' করেছিলেন বটে, কিন্তু গৃহ-প্রবেশের নিমন্ত্রণের বিদায়ে পাঁচসেরি সিদের সঙ্গে একটা করিয়া গিনি আছে খবর পাইয়া মুহূর্ত্তেই রাগ জল করিয়া কহিয়াছিলেন, "পাঁচুর আমাদের অক্ষয় স্বর্গ হ'বে। আজকাল হিন্দুর ছেলেরা কিনা করছে। আর ও তো নিজে শূয়োর ঘাঁটেনা, সবই হাড়ি-বাগদীদের হাতে, এতে ওর দোষ কোনমতেই ধরা উচিত নয়।"

(২)

আট দশটা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে পিছনে করিয়া বাতাসার ঠোঙ্গা হাতে হারাণী বাড়ী ঢুকিল।

ব্রজসুন্দরী তুলসীমঞ্চের উপর বাতাসার ঠোঙ্গা রাখিয়া মিনিট খানেক চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিল, তারপর স্বামীর কপালে ঠেকাইয়া 'হরিবোল' 'হরিবোল' শব্দে হরির-লুট উঠানে ছড়াইয়া দিতেই ছেলেরা কাড়াকাড়ি-মারামারি করিয়া লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইল।

ব্রজসুন্দরী কহিল, "যাক্, হরির-নোট্‌টা তো শেষ হ'ল, এইবার মা-কালীর মানতটা দিয়ে ফেল্‌তে পারলেই নিশ্চিন্দি হই।"

পাঁচকড়ি কহিল, "তুমি ত নিশ্চিন্ত হ'লে, কিন্তু আমার যেচাং এখনও মেটেনি। মকদ্দমায় খালাস পেলুম বটে, কিন্তু কমলীর ছেলেটার খোরাক-পোষাক এখন বরাবর জুগিয়ে যেতে হবে। ঘাড়ের উপর আবার একটা জোয়াল চাপ্‌লো।

"বুঝেছি, টাকা আদায়ের ফিকিরে-ই মাগী ঘুর্‌ছেলো! মরণ আর কি। দিওনা, দিওনা।"

"তা কি হয়, এযে হাকিমের হুকুম।"

ব্রজসুন্দরী কহিল, "তা যাক্, তুমি যে ভালোয় ভালোয় বাড়ী ফিরে আস্‌তে পেয়েছ,—এই ঢের! মা লক্ষ্মীর কিরপায় ও পোষের জন্যে কিছু আসে যাবে না। ধম্মো বলে তো একটা জিনিষ আছে, তার চোখে তো কেউ ধুলো দিতে পার্‌বে না। কমলী হারামজাদী ক'দিন রক্ত-ওঠা পয়সা ভোগ কর্‌তে পারে দেখে নেব।"

ধর্ম্মকথার উত্থাপনে পাঁচকড়ি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া কহিল, "ওসব ধর্ম্ম-টর্ম্ম আমার ভাল লাগে না। এ আমি সহজে ছাড়্‌ছি না, আবার বড় আদালতে নালিশ কর্‌বো।"

ব্রজসুন্দরী কহিল, "তা ক'রো, কিন্তু আগে কালীঘাটে মা'র মানতটা মিটিয়ে আসি চল,—নইলে মা'র কোপ-দিষ্টিতে আবার কিছু অনর্থ ঘট্‌বে।"

পৌষকালী

"যা করবে, তা শীগ্‌গির শীগ্‌গির সেরে ফেল। আমাকে হয়ত দু'চার দিনের মধ্যেই তিনকড়ি উকিলের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হ'বে।"

"তা বেশ ত, এই সংক্রোন্তির দিনই চলনা? পোষ-মাসে মা'কে দেখার মত পুণ্যি কি আর আছে। লোকে কথায় বলে,—বছরে বছরে পোষ-কালী একবার ক'রে দেখতে হয়। তা হলে সব জোগাড়-যন্তর করি,—কি বল?"

ইচ্ছা-অনিচ্ছা মিশ্রিত স্বরে "তা বেশ চল" বলিয়া পাঁচকড়ি শূকরের খোঁয়াড় অভিমুখে চলিয়া গেল।

পুরাতন দাসী হারাণী অন্তরাল হইতে স্বামী-স্ত্রীর এই কথোপকথন শুনিতেছিল। এক্ষণে ব্রজসুন্দরীর নিকট আসিয়া কহিল, "মা ঠা'ন্, আমায় যেন ফেলে যেওনি?"

ব্রজসুন্দরী কহিল, "আ মর্, তুই আবার কোথা যাবি?"

হারাণী কহিল, "আমার যখন বেটা হইছিল, তেখন থেকেই আমি কালীঘাট মানত করেছিলাম, মাঠা'ন্, গরীব-গুড়্বার পয়সার লেগেই হইয়ে উঠে না।"

ব্রজসুন্দরী বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "কালে কালে হ'ল কি? বেটার জন্যে আবার কালীঘাটে মানত করা হয়েছিল,—মরে যাই! যার বাপ-পিতেমোর ঠিক নেই, তার জন্যে আবার ঠাকুরের দোর

ধরা! নীচ জাতের জ্বালায় আর ঠাকুর-দেবতাও থাক্‌বে না! ধম্মো সব জলাঞ্জলি গেল!"

বাহিরে সকলের নিকট অজ্ঞাত হইলেও হারাণীর নিকট শ্রীধরের প্রকৃত পিতার নাম অজ্ঞাত ছিল না। সে কহিল, "দোষ দিওনি মাঠা'ন্, ইত্যি-জাতে দোষ কইলেও ছিরিধর আমার তৃষী কেম্‌নে হ'বে? চাক্‌রী লাগাত এঘর ছেড়ে তো কোথাও যাবার লাগিনি!"

দোষটা ঘরেরই প্রমাণ হইয়া যায় দেখিয়া ব্রজসুন্দরী কহিল, "আ মর্, ছোট জাতের একটা কথার বাঁধনও নেই। যা মুখে আসে ফস্ করে বললেই হল! খবরদার, আর এ রকম করে কথা বলিস্ নি,—পাঁচজনে শুন্‌লে বল্‌বে কি?"

সত্য প্রকাশে রুষ্ট ব্যবহারই মিলিয়া থাকে বলিয়া হারাণী সত্যকে ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "তা যেতে দাও মাঠা'ন্, কিন্তু আমাদের ফেলে যেওনি যেন! আস্‌ছে মাসের পাওনা থেকে মা-বেটার যা খর্‌চা লাগে কাইটে লিও।"

ব্রজসুন্দরী কহিল, "ও সব হবে না, ছোট জাত নিয়ে গিয়ে সেখানে—ঠাকুর-দেবতার স্থানে কি আমি মুস্কিলে পড়্‌বো। আমি পার্‌ব না।" বলিয়া ব্রজসুন্দরী অন্যত্র চলিয়া গেল।

হারাণী আঘাত খাইয়া মনে মনে মা কালীকে স্মরণ করিয়া বলিল, "হেই মা, তোর কি একটু কিরপা নেই মা। ছোট জাত

বইলে কি তোর দেখাও মিল্‌বেক্‌ না! ছোট জাতরা তোর ছিরি-চরণে কি দোষ কইরেছে। যদি দেখাই দিবিক্‌ না, তো আমাদের জনম কেনে দিইলি।" বলিয়া হারাণী আপন মনে কাঁদিয়া ফেলিল। তারপর চক্ষু মুছিয়া কহিল, "তুই এত পয়সা কেনে চিন্‌লি মা? কর্ত্তাবাবুদের শূয়োর বিচা পয়সা আমাদের গতর-ভাঙ্গা পয়সা লেগে শুদ্ধ কি মা। পিত্থিবি-মা'র তো বাচ-বিচের নেই, সে তো সবারে কৈলে ধরে আছে।—তুই কেনে তেমন হইলি মা?"

হারাণীর চোখ পুনরায় জলে ভরিয়া গেল। সে ভাবিল, শ্রীধর যখন কর্ত্তাবাবুর ঔরস-জাত, তখন শ্রীধরের মঙ্গলকামনা কর্ত্তাবাবু নিশ্চয়ই করিবেন। তাই সে কালীঘাট দর্শনের প্রার্থনা লইয়া কর্ত্তাবাবুর গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

পাঁচকড়ি তখন আপীলের চিন্তা করিতেছিল। হারাণীর দু'একটা কথা শুনিয়াই হুঙ্কার দিয়া কহিল, "শীগ্‌গির দূর হয়ে যা ঘর থেকে।"

হারাণী তথাপি মিনতি করিয়া কহিল, "ছিরিধর আপনার কো ত বটে। বেটাকে বাপ কি দয়া কর্‌তেও লারে?"

পাঁচকড়ি অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল, "পাজী, হারামজাদি, ছোটলোক মাগী।—শ্রীধর আমার ছেলে! ওকথা আবার যদি কখনও মুখে আন্‌বি তো জুতো মেরে বিদেয় করে দেব।"

স্বামীর চীৎকারে ব্রজসুন্দরী ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "আ মুয়ে আগুন! আবার এখানে এসেও জুটেছ!"

পাঁচকড়ি ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "এই দেখনা, হারামজাদী এখানে এসে বল্‌ছে—শ্রীধর আমার ছেলে, তাকে কালীঘাটে নিয়ে যেতে হ'বে! ও পাগল হয়েছে,—নিশ্চয়-ই পাগল হয়েছে—"

ব্রজসুন্দরী কথা চাপা দিয়া কোমরে হাত রাখিয়া কহিল, "মাগীর আস্পদ্দা তো কম নয়! রূপের ছিরি তো একেবারে ঠিক্‌রে পড়্‌ছে! তবু যদি একটু দেখবার মতো হ'তিস্, তাহলে না জানি আরও কত কথা বানিয়ে বানিয়ে বলতিস্!"

উভয় পেষণে হারাণী হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কি একটা কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল,—কহিতে পারিল না। কেবলমাত্র অন্তরাল হইতে মদনদেব হাসিয়া কহিলেন "আমার পূজক কি সব সময় রূপ দেখে!"

(৩)

পৌষ সংক্রান্তি।

পাঁচকড়ি সস্ত্রীক কালীঘাটের উদ্দেশে রওনা হইল। দশম বর্ষীয় পুত্র শ্রীধরকে কোলের নিকট টানিয়া হারাণী মানুষের গড়া ব্যবধান বজায় রাখিবার জন্য শুভ যাত্রার সম্মুখে না থাকিয়া দূর

অন্তরাল হইতে সেই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিল। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইতে চাহিল, কিন্তু বাহির হইল না ; কেবলমাত্র দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু শ্রীধরের মস্তকে পড়িল।

শ্রীধর মাতার আর্দ্র চক্ষু দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিল না, কহিল, "মা তুই যাবার লেগে কাঁদ্‌ছিস ? আচ্ছা রোস্—" বলিয়া সে একদৌড়ে বাটীর বাহির হইয়া গেল এবং অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "চল্ কোথায় যাবার চাস্ ?"

হারাণী পুত্রের চিবুক ধরিয়া কহিল, "কেম্‌নে যাব ধন, সে বরাত কি কৈরে আইছি !"

শ্রীধর কোমর হইতে একটী গেঁজিয়া খুলিয়া ত্রিশটী টাকা বাহির করিয়া বলিল, "টাকার অভাব ভাবিস্ ?"

কাহারো অপহৃত টাকা ভাবিয়া হারাণী চুপি চুপি কহিল, "এতটাকা কেম্‌নে পেলিরে।"

পুত্র বুক ফুলাইয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "ভর্ করিস্ কেনে ? এ টাকা সব আমার। বাবুদের থ্যাটারে আমার পালা গাওনার লেগে বাবুরা মাঝে মাঝে আমায় যে টাকা দিইছিল, সে গুলো তোকে না দিইয়ে কল্‌কেতার সিগ্‌রেট আর তামুক খাবার লেগে বিশে দুলের কাছে রাখছিলুম। এখন চাইয়ে আন্‌লুম।"

মাতা পুত্রকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বার্‌বার চুম্বনে অভিষিক্ত করিয়া দিল। শ্রীধর কহিল, "আদর কর্‌বার সময় পরে

ঢের পাবিক্। চল্, এই লাগাৎ টিকিট কিনে আমারও মাকে কালীঘাটে দেখ্‌বার যাই।"

হারাণীর তিরস্কারে মা সত্যই অপমানিতা হইয়াছে ভাবিয়া হারাণী মনে মনে প্রণাম করিয়া কহিল, "যা বৈলেছি তা অপরাধ হইছে, এবাব ক্ষেমা করিস্ মা।"

সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থান হইলেও শ্রীধর সাহসে বুক বাঁধিয়া, মাতাকে লইয়া প্রভু এবং প্রভুপত্নীর অলক্ষিতে তাহাদের সহিত একই ট্রেণে চাপিয়া বসিল।

শিয়ালদহ ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া হারাণী দূরে মাঠা'ন্ ও বাবাঠাকুরকে দেখিয়া শ্রীধরের হাত ধরিয়া তাহাদের লুকাইয়া চলিতেছে, এমন সময় 'হৈ' 'হৈ' শব্দে কোলাহল করিয়া রাস্তার লোক দৌড়াইতে আরম্ভ করিল।

বিপদ সম্মুখীন দেখিয়া হারাণী একবার ভাবিল, দৌড়িয়া গিয়া কর্ত্তাবাবুর শরণাপন্ন হয়; কিন্তু মুখ তুলিয়া দেখিল,—কর্ত্তাবাবু এবং মাঠা'ন্ উভয়েই জনৈক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।

হারাণী পুত্রকে বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। একজন শিখ ট্যাক্সিওয়ালা ছুটিয়া আসিয়া তাহাদিগকে আপন মোটরে উঠাইয়া লইয়া কহিল, "কুছ্ ডর্ নেহি মাঈ। আপ্ কাঁহা যাইয়েগা?"

হারাণী কহিল, "কালীঘাট।"

শিখ কহিল, "আভি কালীঘাট্‌মে বহুত দাঙ্গা চল্‌তা হ্যায়; উধার মাৎ যাইয়ে মাঈ। কোই বাঙ্গালীবাবুকা কোঠীমে চলিয়ে, উধার উতার দেই?" বলিয়া শিখ ঊর্দ্ধশ্বাসে মোটর চালাইয়া জনৈক বাঙ্গালী গৃহস্থের বাটীতে তাহাদিগকে নামাইয়া দিল।

বাটীর গৃহিণী অসহায় বালক ও রমণীকে দেখিয়া সযত্নে উপরে লইয়া গেলেন।

* * * * *

দাঙ্গা থামিয়া গিয়াছে।

স্বর্গীয় মায়ার আকর্ষণকে ছিন্ন করিয়া আসিতে জ্ঞানী-অজ্ঞানী কেহই পারে না! হারাণীও পারে নাই।

গৃহিণী কহিলেন, "দেখ, হারাণী, তুই আর জন্মে নিশ্চয়ই আমার কেউ ছিলি। তা' নইলে তুই আমার কাছেই বা এসে পড়্‌বি কেন, আর আমি-ই বা তোকে ছাড়্‌তে পারছি না কেন!"

হারাণী কহিল, "আমার মনে লাগে, আর জন্মে আমি আপনার বেটী ছিলেম।"

নিভৃতে বসিয়া গৃহিনী হারাণীর আজন্ম দুঃখের ইতিহাস প্রায়ই তাহার নিকট হইতে শুনিতেন এবং ভগবানের বিরুদ্ধতা করিয়া মানুষ মানুষকে কেমন করিয়া দূরে সরাইয়া রাখে, তাহাই ভাবিতেন!

মরণোল্লাস

মাতাকে একলা পাইয়া একদিন শ্রীধর হারাণীকে কহিল, "মা, যে লেগে কল্‌কাতা আইলি, সে কথা বেবাক্ হজম কইরে দিলি!"

হারাণীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, সেই জলভরা চোখে একমুখ হাসিয়া হারাণী পুত্রকে গৃহিণীর নিকট আনিয়া কহিল, "তুই কি চোখের মাথা খাইছিস্! পোষ-সংকেরান্তির দিন ই তো আমরা জ্যন্ত আনন্দময়ীর দেখা পাইলাম। সে দয়াময়ী মায়ের পায়ের ধুলো লিয়ে আবার মাথায় দে।" বলিয়া পুত্রকে গৃহিণীর নিকট অগ্রসর করাইয়া দিল।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পাশের বাড়ীর ছেলে চীৎকার করিয়া বিত্যালয়ের পড়া মুখস্থ করিতে আরম্ভ করিল, "মহাত্মা টলষ্টয় বলিয়া গিয়াছেন,—মিথ্যাকে কখনও মর্য্যাদা দিও না, পৃথিবীতে মানুষ-ই ভগবান।"

'দেশের' টান

ছেলেবেলা হইতেই আমাকে কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, অথচ বংশের অধুনা একমাত্র দুলাল, মাতৃহারা,—ফেলিতেও কেহ পারিত না। কিন্তু একজন ছিলেন, যিনি দোষে-গুণে আমাকে সমভাবেই দেখিতেন;—তিনি আমার ঠাকুর-মা।

আমার জ্বালাতনের বোনাজালে আমাদের বাড়ী থেকে গ্রামের দুলে-বাগ্দী পর্য্যন্ত সকলকে-ই একবার-না—একবার পড়্‌তে হয়েছে, নিষ্কৃতি কেউ যে কখনও পেয়েছিল বলে মনে হয় না। বিধবা পিসিমা পঞ্চপাত্র সামনে রেখে প্রত্যহ-ই চক্ষু মুদে যোগাসনে আহ্নিক কর্‌তে বস্‌তেন, আর আহ্নিক সমাপনান্তে চোখ খুলে দেখ্‌তেন যে পঞ্চপাত্রটা পাত্‌কো-তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে। অমনি আমার ডাক পড়্‌তো। আমি বল্‌তুম, যত কি আমারই দোষ! আমি ছাড়া কাক, ইঁদুর, কাঠ্‌-বেড়ালী বুঝি আর কিছুই বাড়ীতে নেই। সেই মুহূর্ত্তে ঠাকু'মা আসিয়া "বটে-ই ত" বলিয়া সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতেন। পরদিন থেকে পিসিমা একহাতে পঞ্চপাত্রটা ধরে ধ্যান কর্‌তেন!

বাবাকে প্রকাশ্যে খুবই ভয় কর্‌তুম, কিন্তু তাঁর অসাক্ষাতে তাঁর ক্যাস্‌-বাক্সে নকল চাবি লাগাতে ও তাঁর সদ্য-পীত হুঁকোটায়

মুখ দিতেও ছাড়্‌তুম না। গ্রাম বাসীরা যে বাগানটায় কাঁটার বেড়া দিত, সেই বাগানটার উপরই আমার নজর পড়্‌তো বেশী। আমার প্রতি দুটো প্রাণখুলে গালাগালি দিয়েও তারা তাদের ক্ষতিপূরণ কর্‌তে সাহস কর্‌ত না,—কেননা আমি জমিদার-পুত্র! অধিকন্তু ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মশাপ। বাড়ীতে যখন সকলে একান্ত অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌তো, তখন তাঁরা আমায় না বকেও থাক্‌তে পার্‌তেন না, কিন্তু লাগাম টেনে,—ঠাকুমার ভয়ে!

উপনয়ন সংস্কারান্তে বাবা আমায় গ্রামের মধ্য-ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি কর্‌বার মনস্থ কর্‌লেন। কিন্তু জন্মাবধি দিবারাত্র পল্লীর উন্মুক্ত বাতাসে ছুটাছুটি করিয়া কাটানোর পর কেমন ক'রে সেই রুদ্ধ টিনের অন্ধকূপের মধ্যে কাটাবো স্মরণ ক'রে আগে থেকেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। নিরুপায়ের উপায় ঠাকু'মার কাছে গিয়ে আমি কান্নাকাটী আরম্ভ করে দিলুম। ঠাকু'মা বাবাকে ডেকে বল্‌লেন, "এ তোমার বড় অন্যায় বাছা। ছেলের অনিচ্ছা-সত্বেও তাকে জোর করে কখনও লেখা পড়া শেখান যায়! আর, এই বয়সেই ওকে অতটা পীড়ন কর্‌লে চল্‌বে কেন? বেঁচে থাকলে ও আপনা হতেই ঘটকর্পর, কালিদাস-বররুচির পাশে আসন করে নেবে!" বাবা গম্ভীর ভাবে "আচ্ছা বেশ" বলে চলে গেলেন। আমি এতক্ষণ বাবার উত্তরের প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হ'য়ে জানলার পিছনে লুকিয়ে ছিলুম। বাবা চলে যেতেই

ছুটে এসে ঠাকু'মার গলা জড়িয়ে ধরে খানিকটা হেসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

আমাদের বাড়ী দেবগ্রাম, চল্‌তি কথায় লোকে 'দে-গাঁ' বলে থাকে। বর্দ্ধমান ষ্টেশন থেকে প্রায় ১৪ মাইল পথ। বর্দ্ধমান সহরে লাট আস্‌বে শুনে একবার মাত্র আমি আমাদের গাঁ ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলুম; তাও চোদ্দ বছর বয়সে। বাড়ীতে আমার এক মামা ছিলেন, তিনি-ই ভুলিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে যাহোক ক'রে আমায় 'আখ্যান-মঞ্জরী' আর 'কিং-রিডারে'র খানিকটা খানিকটা পড়িয়েছিলেন।

হাঁ, একটা আমার গর্ব্বের আর লাভের কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। আমার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তিনি বোমার মামলায় পড়ে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস কর্‌ছেন। আমি তাঁর ভ্রাতা, অতএব এখনকার যুগে আমি দেশের গর্ব্বের সামগ্রী এবং লাভ,— দাদার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে আমিই পিতার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।

দিনগুলো আমার বেশ কাট্‌ছিল। হঠাৎ একদিন ভোর বেলা দেখি আমাদের বাড়ীর চতুর্দ্দিক সহরের পুলিশ ঘেরাও করেছে। খবর পেলুম, কোথায় নাকি রেল-লাইন খুলে কা'রা ট্রেন উল্টাবার চেষ্টা করেছিল, তাই দিকে-দিকে পুলিশ তদন্তে বেরিয়েছে। ঘণ্টা-তিনেক সারা গাঁ-টা খানাতল্লাসের পর সন্দেহ

জনক কিছু না পেয়ে তারা তো চলে গেল। কিন্তু বাবা ভয়ে সারাদিন একবিন্দু জলগ্রহণও করেন নি।

এই রকম নিরক্ষর, নিষ্কর্ম্মা হয়ে নিরর্থক ঘুরে ঘুরে বেড়ালে আমার প্রতি ও পুলিশের দৃষ্টি পড়্‌তে পারে ভেবে বাবা আবার আমাকে স্কুলে ঢোকাবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঠাকু'মা বেঁচে থাকতে সে চেষ্টায় ব্যর্থ হ'য়ে গোপনে আমাকে অন্যত্র বোর্ডিংএ পাঠাবার ব্যবস্থা হ'ল।

আমার কাছে সে কথা বেশীক্ষণ গোপন রইল না। জান্‌তে পারলুম, আমার নির্ব্বাসন স্থান—কল্‌কাতা। আজব সহর হ'লেও অন্যান্য পাড়াগেঁয়ে ছেলেদের মত কল্‌কাতা দেখবার সখ আমার মোটে-ই হ'ত না বরং ভয়ের সঞ্চার হ'ত।

যাই হোক্, যাবার দিন কেমন করে এ খবর ঠাকু'মা জানতে পেরে গরুর গাড়ীর উপর ঝাঁপিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগ্‌লেন। আমিও থাকতে পারলুম না, কাঁদতে আরম্ভ করলুম। অশ্রু-সিক্ত ঝাপ্‌সা চোখে দেখ্‌তে পেলুম,—আবাল্য-স্মৃতি-জড়িত গ্রামের সমস্ত গাছপালা, ক্ষেত-খামার, বারোয়ারীতলা, পুকুরঘাট, সবই যেন আমার সাথে সাথে কাঁদতে লেগেছে। কিন্তু বাবার কটাক্ষের কাছে তা'দের তীব্র আকর্ষণ মুহূর্ত্তে শিথিল হ'য়ে গেল। ঠাকু'মাকে,কে জানিনা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তারপর আমার গাড়ী ক্ষেতের উপর দিয়ে ষ্টেশনের পথ ধরলো।

বোর্ডিংএ দিন কতক বেশ শান্তশিষ্ট ভাবেই লেখাপড়া করলুম। তাদের কম্পাউণ্ডের বাইরে আমি আদৌ যেতে পেতুম না। আহার, নিদ্রা, স্নান, ভ্রমণ সবই তার ভিতরে। এক-একদিন প্রাণটা ভয়ানক হাঁপিয়ে উঠ্‌তো। মন যখন 'দেশের' সুবিস্তৃত মাঠের কথা মাঝে মাঝে তুলতো, তখন তাকে অনেক ক'রে বোঝাবার চেষ্টা করতুম যে, এই বোর্ডিং-কম্পাউণ্ডই তোর সেই মাঠ—আজ সংকীর্ণ হয়ে গেছে; কিন্তু মন তা' বুঝতে চাইতো না। বাবার জন্য আমার ততটা কষ্ট হ'ত না, কিন্তু ঠাকু'মার অভাব আমি বিশেষ ক'রেই বোধ করতুম, কেননা বাড়ীর মতই তিরস্কার এখানে ভোগ করতে হ'ত, কিন্তু জুড়াবার জন্য ঠাকু'মাকে পেতুম না।

দিন কয়েকের মধ্যে-ই শিক্ষকেরা আমার গ্রাম্য অসভ্যতা কে সভ্য করিয়েছিলেন, চরিত্রকে নিষ্কলঙ্ক করিয়ে তুলেছিলেন, ব্যবহারকে শিষ্ট করিয়েছিলেন, বুদ্ধিকে উন্নত করিয়ে ছিলেন, কিন্তু সংকীর্ণতার মধ্যে বেঁধে আমার অগোচর দুরন্ত মনকে তাঁরা শাসন করতে পারেন নি!

একদিন ক্লাশের একজন ছেলের কাছে খবর পেলুম যে, 'কংগ্রেস আফিসে' কোথাকার সত্যাগ্রহের জন্য স্বেচ্ছা-সেবক নেওয়া হচ্ছে। কথাটা শুনে-ই মাথাটা একটু বিগ্‌ড়ে গেল। পরদিন রাত্রে কম্পাউণ্ডের পাঁচীল টপ্‌কিয়ে খোঁজ নিয়ে 'কংগ্রেস অফিসে' গিয়ে

নাম লিখিয়ে যেখানে সত্যাগ্রহ হচ্ছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে দু'চারদিন লোকের বাড়ী বাড়ী বেশ খাওয়া-দাওয়া গেল। তারপর একদিন একটা দলের সঙ্গে আমায়-ও পুলিশ কোর্টে টেনে নিয়ে গেল। বিচারে দোষ প্রমাণিত হওয়ায় তিন মাসের জন্য আমায় কারাগারে আবদ্ধ হয়ে থাক্‌তে হ'ল।

জেল থেকে কল্‌কাতায় ফিরে দু'দিন 'হা অন্ন' 'হা অন্ন' করবার পর বাবাকে টাকার জন্য চিঠি লিখ্‌লুম। বাবা টাকা পাঠালেন না, কিন্তু চিঠির উত্তর দিলেন, "কুলাঙ্গার, তুমি আমার ত্যজ্য-পুত্র। আর তোমার মুখদর্শন করতে চাইনা, টাকাও পাঠাতে পারবো না।"

মনটা ভয়ানক দমে গেল। চোখ ফেটে জল বা'র হয়ে এল। ছেলে যতই দোষী হোক্‌, তথাপি তাকে অনাহারে মর্‌তে দেওয়া কি বাপের কর্ত্তব্য! ঠাকু'মা বেটিও কি মরে গেছে! সে কি আমার কথা শোনেনি!—নিশ্চয়-ই শুনেছে! প্রচণ্ড রাগে সর্ব্ব-শরীর কেঁপে উঠ্‌লো, প্রতিজ্ঞা কর্‌লুম,—এ জীবনে আমিও আমার আপনার লোকের আর মুখ দেখ্‌বো না, সে-গাঁয়ের দিকে ফিরেও তাকাবনা—স্বাবলম্বী হ'ব। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে মনকে শান্ত ক'রে জানিয়ে দিলুম, যে, জগতে তুই একা, তোর আপনার জনও কেউ নেই,—তোর স্থান ও নেই। সবই তোকে বাইরে থেকে নিজে খুঁজে নিতে হ'বে।

একটা মেসে ১০৲ টাকা খোরাকী আর ৪৲ টাকা 'সিট্' ভাড়া দিয়ে চৌরাস্তার মোড়ে খবরের কাগজ বেচে আমার দিনগুলো একরকম কাটতে লাগ্‌লো। গ্রামের একটা লোক কল্‌কাতায় এসে গোপনে আমার এই অবস্থা দেখে গিয়ে ঠাকু'মাকে খবর দিয়েছিল। তার দু'চার দিনের মধ্যেই একদিন ঠাকু'মা খোঁজ ক'রে ক'রে আমার মেসে এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখেই আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠ্‌লো। মেসের ঝিকে দিয়ে পাগল বানিয়ে তখুনি তাঁকে দূর ক'রে দিয়ে তবে নিশ্চিন্ত হলুম। পরে ঝিকে জিজ্ঞেস্ ক'রে জেনেছিলুম যে, যাবার সময় ঠাকু'মা নাকি খুব কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে গিয়েছিলেন।

দুর্গাপূজার ছুটিতে কাগজ বন্ধর দরুণ চারদিন রেহাই পেয়ে আমার সহকর্মীরা ঠিক করলে মধুপুর যাওয়া হ'বে। আমি প্রথমটা রাজী হ'লুম না। মনে মনে ভাবলুম,—মধুপুরের পথে যে বর্দ্ধমান ষ্টেশন পড়্‌বে। না, কখন-ই যাওয়া হ'তে পারেনা। পূর্ব্বকথা স্মরণ করে রাগে আমার গা গরম হ'য়ে উঠ্‌লো। তাদেরকে শুধু বল্‌লুম,—আমার যাওয়া হ'বে না। তারা কিন্তু কোনমতে-ই ছাড়্‌লেনা; 'এক যাত্রায় পৃথক ফল' আউড়ে যখন তারা আমায় নিতান্ত চেপে ধরলে, তখন বাধ্য হ'য়ে আমাকেও বিছানা বাঁধতে হ'ল। মনে স্থির করে রাখলুম যে, বর্দ্ধমানের কাছটা চোখ বুঁজে থাক্‌বো,—চোখেও আর বর্দ্ধমান জেলাটার কোন অংশ দেখ্‌বো না।

(৩)

রাত্রি আটটা। গাড়ী ছাড়্তে তখনও আধঘণ্টা দেরী। টিকিট কিনে গাড়ীতে বসে সকলে তাস খেল্তে আরম্ভ কর্‌লে। আমি তাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতে পার্‌লুম না, বিমনা হ'য়ে রইলুম। অনেকের অনেক রকম ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করলুম। তারপর বিছানা পেতে পকেট থেকে খানিকটা সিদ্ধিবাঁটা বা'র করে মুখে পুরে গভীর নিদ্রার আরাধনা কর্‌তে লাগলুম। বলা বাহুল্য, সিদ্ধির কৃপা আমার প্রতি শীঘ্রই হ'য়েছিল, কেননা কখন গাড়ী ছেড়েছিলো তা আমি একেবারেই অনুভব কর্‌তে পারিনি।

'বর্দ্ধমা-আ-আ-ন!' 'বর্দ্ধমা-আ-আ-ন!' কুলীর চীৎকারে আর গাড়ী থামার ঝাঁকানিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জোর ক'রে চোখ বন্ধ করে রইলুম, কিন্তু চোখ না দেখ্‌লেও আমার মন দেখ্‌তে পাচ্ছিল—ঐ যে ওভার-ব্রিজ,—কাটোয়ার রাস্তা! ঐ যে বাড়ীর টিনের ছাদটা! ঐ যে তাল পুকুর—বারোয়ারীতলা! ঐ যে বকুল-গাছটা—স্কুল বাড়ী! ঐ যে বাবা! ঐ যে আমার ঠাকুমা! না আর থাক্‌তে পারিনা,—ঐ যে সকলে আমার দিকে চেয়ে আছে!

মন্ত্র-মুগ্ধের মত কখন যে আমি গাড়ী থেকে প্লাট-ফরমে নেমে পড়েছিলুম তা জানি না; সহযাত্রী বন্ধুরা তাড়াতাড়ি এসে আমাকে ধর্‌তেই আমার চেতনা হ'ল। আমাকে তারা গাড়ীতে উঠ্‌তে

বললে, আমি ছোট ছেলের মত চীৎকার করে কেঁদে বললুম,— আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাবনা।

আমার ইতিহাস না জানার দরুণ তারা আমার অবস্থা ঠিক বুঝতে পারলেনা, ভাবলে, আমি পাগল হয়ে গেছি! জোর ক'রে যখন তারা সবাই মিলে আমাকে গাড়ীতে তুলে আনলে, তখন আমি সত্যই পাগলের মত মার-পিট আরম্ভ করলুম। তারা ভয়ে ছেড়ে দিতেই আমি গাড়ী থেকে লাফ দিয়ে কাটোয়ার পথ ধরলুম।

*   *   *   *

তখন রাত্রি দুইটা।

পাগলের মত হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ীর দরজার সামনে এসে থমকে গেলুম। দেখলুম, একটা বাঁশের খাটিয়া বাঁধা পড়ে রয়েছে, আর বাবা ও অন্যান্য সকলে মিলে ধরাধরি করে ঠাকু'মার মৃতদেহটা বাইরে নিয়ে আসছেন।

পথরোধ

"মা-লে খেতে দিবি না ?"

"পোড়ার-মুখো ছেলে কোথাকার, দিন-রাত্তির খেতে দিবিনা আর খেতে দিবিনা,—মুখে আর অন্য বাক্যি নেই !"

"তুই পোলাল-মুখো ,—থাতু-মা কে বলে দোব।"

"আদরের নাতি হয়েছিস্, যা তোর ঠাকু'মার কাছে যা,—সোহাগ করে গেলাবে এখন" বলিয়া কুসুম-কুমারী দেড বৎসর বয়স্ক পুত্রের মস্তকটী নাড়িয়া ঠেলিয়া দিয়া স্বামীর পানের কৌটা মধ্যে পান ভরিতে লাগিল. পুত্র চীৎকার করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

ক্রন্দনের রোল ক্রমান্বয়ে উচ্চে উঠিতেছে দেখিয়া কুসুমকুমারী পুত্রের মুখের উপর হস্ত-প্রদানান্তর কহিল, "হারামজাদা ছেলে চুপ্ কর্‌রে বাবা চুপ্ কর্ ! রাক্ষুসী মাগী শুন্‌তে পেলে আমায় আর আস্ত রাখ্‌বে না ! একে ত জ্বলে পুড়ে মলুম, তার উপর তুই ও এরকম ক'রে জ্বালাস্ যদি তা'হলে আর বেঁচে লাভ কি।"

মাতা কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পুত্র পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর

চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে চীৎকারের অর্থ—পিতামহীর কর্ণে যাহাতে ক্রন্দনের স্বরটা পৌঁছিতে পারে।

কুসুম-কুমারী বিরক্ত হইয়া আপন মনে কপাল চাপ্‌ড়াইয়া কহিল, "পোড়া কপালীদের আবার ছেলে হত্‌কে সুখ হবে!—তা হলেই হয়েছে! পেটের ছেলের মত শত্রু আর কি ত্রিভুবনে আছে! পোড়া-মানুষের পেটে ভগবান্ ছেলে কেন দেয় গো!—আঁটকুড়িদের গায়ের বাতাস লাগ্‌লেও পুণ্যি আছে!"

কুসুম-কুমারী যাহা ভাবিল, তাহাই ঘটিল। গো শালা হইতে কোমরে আঁচল জড়াইয়া কর্ত্তিত-কেশা শ্বশ্রূ-ঠাকুরাণী গোময় লেপিত হস্তে হন্ হন্ করিয়া আসিয়া পৌত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে যাদু!— কে মেরেছে ধন?"

ঠাকুর মাকে দেখিয়া যাদুর ক্রন্দন নিমেষে থামিয়া গেল। সজল চক্ষে গম্ভীর মুখে কুসুম-কুমারীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "মা।"

পৌত্র-মুখ হইতে 'মা' কথাটী শুনিবার জন্য ঠাকুর মা এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিলেন। কহিলেন, "বলি, হ্যাঁগা বউ, তোমার আক্কেলটা কি রকম শুনি? ছেলের গায়ে হাত তোল কেমন করে! ছেলের গায়ে হাত তুলতে তোমায় বারবার মানা ক'রে দিয়েছি-না? —আবার সেই কাজ! খবরদার বলছি, আর কখনও ছেলের গায়ে হাত তুলো না!—জাননা, ছেলেই হচ্ছে স্বয়ং নারায়ণ।"

মাতাকে তিরস্কৃত করিতে পারিয়াছে দেখিয়া মনে মনে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া শিশু সজল-নয়নে, স-হাস্য বদনে কহিল, "থাতু-মা তোলে—"

"এস ধন আমার এস" বলিয়া গোময় লেপিত হস্তে সাবধানে পৌত্রকে ক্রোড়ে উঠাইয়া ঠাকুর-মা চলিয়া গেলেন।

(২)

"মুখটা আজ অমন ভারি ভারি যে !"

"হুঁ" বলিয়া একটা ছোট উত্তর দিয়া শচীন্দ্রনাথ নির্জীবের মত ঘরের এক কোণে বসিয়া পড়িল।

জমিদারের কাছারী-বাড়ী তাঁহার বসত-বাড়ীর সহিত সংলগ্ন। শচীন্দ্রনাথ সেইখানে হিসাব-নবিশী করে। মধ্যাহ্নে কার্য্যান্তে বাটীতে ফিরিয়া শচীন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথমে তরুণী পত্নী কুসুমের সহিত কিয়ৎক্ষণ রসালাপ করিবার পর স্নানাহার করিতে যায়। আজ তাহার ব্যতিক্রম ঘটায় কুসুম-কুমারী আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া স্বামীর সম্মুখে উপবেশন করিয়া কহিল, "কি হয়েছে খুলে বল না! আমায় বুঝি শুনতে নেই!"

"যাও, যাও এখন, পরে বল্‌বো।" বলিয়া শচীন্দ্রনাথ দুই হাটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কুসুমকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "বেলা যে পড়ে এল—খাওয়া দাওয়া কর্‌বে না?"

"ভাত হ'য়ে থাকে যদি দু'টো এনে দাও।"

"চান্ কর্‌বেনা?"

"না, আজ আর চান কর্‌বো না—ভাত নিয়ে এস।"

আহারের পূর্ব্বে আর কোন কথা উত্থাপন করা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া কুসুম-কুমারী ভাত আনিয়া দিল।

শচীন্দ্রনাথ দুই-এক গ্রাস ভাত মুখে উঠাইয়াই কহিল, "আর ভাত খেতে পারবো না, থালা নিয়ে যাও।"

"কেন,—ভাত খাবেনা কেন।"

"শরীরটা তত ভাল বোধ কর্‌ছি না—খুব সম্ভব জ্বর এসেছে।"

"এই ত সবে পাঁচ-সাত দিন ভাত খেয়েছ—আবার জ্বর!"

"জ্বরের দোষ কিছু নেই" বলিয়া শচীন্দ্রনাথ শয়ন করিবার জন্য কুসুম-কুমারীকে মাদুর পাতিয়া দিতে আদেশ করিল। কুসুম-কুমারী মাদুর পাতিয়া স্বামীর কপালে হাতদিয়া গরম অনুভব করিয়া কহিল, "ওঃ! তোমার গা যে ভয়ানক গরম! যোগীন্ কব্‌রেজকে খবর পাঠাই— কি বল!"

শচীন্দ্রনাথ হাত নাড়িয়া নিষেধ করিল। কহিল, "আর কব্‌রেজ!—দু'দিন বাদে খাবার পয়সা কোথা থেকে জোটাবে তাই ভাব।"

কুসুম-কুমারী তাড়াতাড়ি কহিল, "মাগো!—অমন অলক্ষুণে কথা শুধু শুধু বলছ কেন?"

শচীন্দ্রনাথ রক্ত-চক্ষুর্দ্বয় বাহির করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল, "শুধু শুধু নয় কুসুম,—শুধু শুধু নয়। নিজেদের দু'এক বিঘে জমি থাক্‌ত—চাকরীর তোয়াক্কা কর্‌তুম না। যাক্‌, জমিদারের চাকরী গেছে—আপদ গেছে।"

"আবার জমীদারের সঙ্গে কি গোলযোগ ক'রে এলে! তুমি বাপু বড় একগুঁয়ে লোক! জমিদার ভিন্ন যখন আমাদের একদণ্ড চল্‌বে না, তখন তাঁর সঙ্গে রেষারেষি ক'রে কি লাভ! আর তিনি হ'লেন মনিব—একরকম গাঁয়ের মাথা।"

"মনিব কে কা'র কুসুম! ভগবান কাউকে কখন মনিব ভৃত্য তৈরী করে পাঠান নি! মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্যই মানুষের জন্ম। মানুষ অক্ষম হ'য়ে পৃথিবীতে আসে বটে, কিন্তু অক্ষমতাতেই তার পরিসমাপ্তি হওয়া উচিত নয়। সুদীর্ঘ-জীবন-যাত্রার মধ্যে তাকে বিচিত্র দুঃখ-দুর্দ্দশার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তা'র দাবী আদায় করে নিতে হয়। নিজেকে নিজের ভেতর ঢাকা দিয়ে রাখ্‌তে যে চায়—তার বনে বাস করাই ভাল।"

"তা হলেও, পাঁচজনে যখন খাতির করে মেনে চল্‌ছে, তখন তোমার একলার অত মাথা ব্যথা কেন?"

"পাঁচজনেই ত সর্ব্বনাশ করেছে! পাঁচজনেই ছোট হ'য়ে

এক জনকে বড় ক'রে তা'র অসঙ্গত অন্যায় অত্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেরা গৌরব বোধ করে। তাতে অত্যাচারীর অত্যাচার ক্রমশঃ বেড়েই চলে।"

"বাড়লেও তুমি কেন নিজের বিপদ নিজে টেনে আন্‌ছ? পরের হিত-অহিতে তোমার কি দরকার ছিল। মুখ বুঁজে আপনার কাজ করে চলে এলেই পারো!"

"ভাব্‌তুম, কখনও বল্‌বোনা, কিন্তু আজ বড় আঘাত লেগেছিল বলেই আর সহ্য কর্‌তে পার্‌লুম না—রূক্ষ কথা বলে ফেল্লুম! সহ্যের একটা সীমা আছে, কিন্তু সে সীমা যখন পার হয়ে যায় তখন মানুষকে বেঁধে রাখা বড় শক্ত!"

"কি কারণে তোমাদের এত রেষা-রেষি হ'ল শুনতে পাই না?"

"শুন্‌বে? শুন্‌বে?" বলিয়া শচীন্দ্রনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বসিল, তারপর পুনরায় শুইয়া পড়িয়া কহিল, "না, সে অতি কুৎসিত প্রস্তাব কুসুম!—সে কথা তুমি বেঁচে থাক্‌তে কখনও বল্‌তে পারবো না, যদি নেহাৎ শুনতে চাও তবে আগে তোমায় খানিকটা বিষ খাইয়ে দিয়ে তার পর বল্‌বো।"

কুসুম-কুমারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "ওগো, তুমি অমন করে জ্বর গায়ে রেগে উঠোনা—স্থির হও। আমি সব বুঝেছি, আমার আর শোন্‌বার দরকার নেই।"

"না, কুসুম, এ স্থির হ'য়ে বল্‌বার কথা নয়। প্রবলদের

অত্যাচার দুর্ব্বলদেরই দমন কর্‌তে হবে, প্রবল প্রবলের অত্যাচারে শুধু সহানুভূতিই দেখিয়ে যায়।"

কুসুম-কুমারী আর অন্য কথার উত্থাপন না করিয়া শচীন্দ্রনাথের শয্যা রচনায় মন দিল।

গভীর রাত্রে কুসুম নিদ্রিত স্বামীর কপালে পাঁচটি পয়সা স্পর্শ করাইয়া গোপনে গ্রামের সীমান্তে খর্গেশ্বরের মন্দির অভিমুখে যাত্রা করিল।

(৩)

পরদিন প্রাতঃকালে শশব্যস্তে শচীন্দ্রের মাতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "বলি, শচীন্—একি কথা! আমার মুখ দেখান যে ভার হয়ে উঠ্‌লো!"

আগ্রহান্বিত হইয়া শচীন্দ্রনাথ মাতার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, "কি মা!"

"মনে করেছিলুম তোর শরীর খারাপ—এখন আর তোর কাণে একথা তুলবো না, কিন্তু এ কেলেঙ্কারী কি চাপা দিয়ে রাখা যায়? যত জ্বালা পোয়াতে হ'বে সেই আমাকেই!"

"তোমার আবার কি হল?"

"আমার নয় ত আর কা'র কি হ'বে বল্‌না? সত্য কলুর বাড়ীতে তেল আন্‌তে পাঠালুম—বল্‌লে, ও বাড়ীতে তেল বেচ্‌তে

পার্‌বো না। সিদে মুদির দোকানে আমি নিজে গেলুম, তা সওদা দেওয়া ত দূরের কথা, আমি যে জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিলুম সে জায়গাটা পর্য্যন্ত গোবর-জল দিয়ে নিকোলে।"

শচীন্দ্র মাতার কথা, ঠিকমত বুঝিতে পারিল না , ভাবিল, হয়ত জমিদারের প্রতি তাহার ঔদ্ধত্য প্রকাশের জন্য জমিদারের ভয়ে গ্রাম বাসীরা তাহাদের প্রতি এইরূপ আচরণ করিতেছে। তাই কহিল, "পৃথিবীতে আর কি জায়গা নেই ?—আর কি চাকরী জুটবে না। আমরা কালই এ গাঁ ছেড়ে চলে যাব—চল। আমি ঠিক কাজই করে এসেছি—কোন অন্যায় করিনি।"

"বালাই ষাট।—তুই কেন অন্যায় কর্‌তে যাবি ! তোর বাপের বংশের নিন্দে কখন কাকে-কোকিলেও শোনেনি, আর আজ এ কি কলঙ্ক।"

শচীন্দ্রনাথ মাতার কথার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া কহিল, "তুমি কি বল্‌ছ—আমি ঠিক ধর্‌তে পার্‌ছি না।"

মাতা গালে একটী অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া কহিলেন "ওমা, তুই বুঝি কিছুই জানিস্‌নে ! তা জান্‌বি বা কেমন ক'রে,—কাল থেকে ত অসুখেই পড়ে আছিস্ ! আমিও কি ছাই জান্‌তে পার্‌তুম ! —গয়লাণী মাগী এসে আমায় বল্‌লে, তাই না—"

"কি বল্‌লে ?"

"বল্‌বে আর কি !—এই তোমার গুণময়ী বউয়ের গুণের কথা।

রাত দুপুরে রোগা সোয়ামীকে ফেলে রেখে আবাগীর বেটী জমিদার বাড়ীর দরজায় গিয়ে ধন্না দেয়! পড়বি ত পড় গয়লা মাগীরই চোখে! গেরোস্তর বউয়ের এই কাণ্ড! আবাগী! হারামজাদি! ছোটলোকের-মেয়ে! ঝাঁটা মেরে বাড়ী থেকে বিদেয় করে দাও।"

শচীন্দ্রনাথ কুসুমের প্রতি মুখ ফিরাইয়া কটাক্ষ করিয়া কহিল, "একি সত্য!"

কুসুম-কুমারী উত্তর দিল না, ত্রস্তে উঠিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর চরণদ্বয় জড়াইয়া ধরিল।

"ভাল মানুষ সেজে আর পায়ে ধরে আদিখ্যেতা দেখাতে হবেনা। এসব মেয়েমানুষের গায়ের বাতাসও পাপ" বলিয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণী পা ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন।

(৪)

শচীন্দ্রনাথ ভূলুণ্ঠিতা কুসুম-কুমারীর প্রতি-চাহিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিল, "কুসুম!"

কুসুম-কুমারী ধীরে ধীরে উঠিয়া অধোবদনে বসিয়া রহিল। উত্তর দিতে পারিল না।

শচীন্দ্রনাথ কহিল, "তোমার উপর বিশ্বাস রাখ্‌তে পারি কি?"

কুসুম অধোবদনেই কহিল, ' সেটা এখন তোমাদের ইচ্ছা।"

"না, ইচ্ছা অনিচ্ছা আমার কাছে কিছু নেই। যেটা প্রকৃত সত্য সেটাকেই আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করবো।"

"তবে আমার নিকট যাহা সত্য তা' বলে যাচ্ছি তোমাদের যে ভাবে ইচ্ছা হয় গ্রহণ ক'রো" বলিয়া কুসুম কহিল, "এর আগে যতবারই তোমার অসুখ হয়েছে. ততবারই তোমার রোগ মুক্তির কামনায় আমি মন্দিরে পূজো দিয়ে আসতুম। কাল রাত্রেও যখন খর্গেশ্বরের মন্দিরে যাচ্ছিলুম তখন কোথা থেকে হঠাৎ গয়লাণী এসে আমার হাতটা ধরে বললে—জমিদার ডাকছে, চল। আমি প্রাণপণে চীৎকার করে উঠতেই সে আমার হাত ছেড়ে দিলে। তারপরেই স্বয়ং জমিদারকে দূরে দেখে আমি ছুটে বাড়ী চলে আসি। এর বেশী আমি আর কিছু জানিনা।"

"তুমি এ কথা আমায় এতক্ষণ জানাওনি কেন?"

কুসুম কহিল, "এখন এ কথার চাইতে তোমার প্রাণ রক্ষাটা আগে দরকার বলে কোন কথাই তুলিনি, পরে জানাব ভেবেছিলুম।"

শচীন্দ্রনাথ লাফাইয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল, তাহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইয়া উঠিল, গাত্র বহিয়া ঘর্ম্ম ঝরিতে লাগিল। বাহির হইতে শচীন্দ্রের মাতা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ছুঁসনে, ছুঁসনে হারামজাদীকে, বেজাতকে ছুঁয়ে জ্বর গায়ে আবার চান করবি!"

কুসুম করজোড়ে কহিল, "ওগো, আমি তাই—কুলটা তুমি অমন করে জ্বর গায়ে লাফিয়ে উঠোনা—শান্ত হও।"

"না" বলিয়া শচীন্দ্রনাথ কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। কুসুম অগ্রসর হইয়া একবার স্বামীকে ধরিতে গেল, কিন্তু ধরিল না। হঠাৎ আপনাকে সংযত করিয়া দূরে সরিয়া গেল।

শচীন্দ্রনাথ ক্রোধে অন্ধ হইয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইয়া কহিল,

"কৈ আমার লাঠিটা কৈ!" "ওগো, আমি এখুনি তোমার বাড়ী থেকে ব'ার হয়ে যাচ্ছি, কিন্তু তুমি ওরকম উত্তেজিত হয়ে উঠোনা।"

শচীন্দ্রনাথ সে কথা কর্ণে তুলিল না। "আজ সব খুন করবো—আজ সব খুন করবো" বলিতে বলিতে উঠান হইতে একটী বংশ-যষ্টি কুড়াইয়া লইয়া শচীন্দ্রনাথ টলিতে টলিতে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

অসুস্থাবস্থায় শচীন্দ্রনাথ বাটীর বাহির হইয়া গিয়াছে খবর পাইয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণী আসিয়া পুত্রবধুর উপর সকল দোষ চাপাইয়া কহিল, "তুই সর্ব্বনাশী-ই ত আমার বাছার সর্ব্বনাশ করতে বসেছিস্। তোর একটু আক্কেল হলনা। অমন অবস্থায় বাছাকে আমায় ছেড়ে দিলি কেমন করে!"

কুসুম কহিল, "আমার ত আর সে শক্তি সেই, আমি ত আর তাঁকে স্পর্শ করতে পারিনা।"

"নেকি, মন্দমাগী হ'য়ে একটা রোগা লোককে আটকে রাখ্‌তে পারিস্‌ না! হাড়-হাবাতে ঘরের মেয়ে হ'লে এমনি ধারাই হয়!"

কুসুম ধীর-নম্র বচনে কহিল, "মাগো, আমি আর তোমাদের কেউ নয়, আমি তোমাদের নিকট অস্পৃশ্যা!

"ন্যাকামো ত খুব শিখেছ! যাও এইবার ঘর ছেড়ে একটা-আধটা বৈরাগীর চেষ্টা দেখগে,—আর কেন?"

কুসুম শশ্রূঠাকুরাণীর কথার সমর্থন করিয়া ভাবিল সত্যই ত, —আর কেন! স্বামীর নিকট স্ত্রী যখন অস্পৃশ্যা, কুলটা হয়, তখন তার আর সংসারে থাকা ত চলে না! সংশয়-দৃষ্টির সম্মুখে সে ত টিকিতে পারিবে না! এক আত্ম-হত্যার দ্বারা সে সকল সংশয়-অসংশয়ের মূলোচ্ছেদ করিতে পারে বটে, কিন্তু সে মরিয়াও ত সুখ নাই। তাহাতে সংশয়ের বীজ ত দূর হইবে না, বরং সু-অঙ্কুরিত হইয়া পত্র-পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠিবে! তবে কি সে সেই অনন্তপথে ধাবিতা হইবে—যেখানে মানুষ নিন্দা-গ্লানিকে তুচ্ছ ক'রে অতীতভোলা-চিরমঙ্গলময়ের অন্বেষণ করে! হাঁ, সেই উত্তম! লোকে চিরকাল অপবাদ রটনা করিবেই; কিন্তু কর্ণ ত তাহার বধির থাকিবে!

কুসুমের বোধ হইল কে যেন তাহার পশ্চাদ্দেশ হইতে ধীরে ধীরে ঠেলিতে লাগিল। বোধহয় সে একটু অগ্রসরও হইয়াছিল এমন সময় দ্বারদেশে কম্পিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "কুসুম!"

কুসুমের স্বপ্ন ও চিন্তা নিমেষে উড়িয়া গেল। শ্বশ্রূঠাকুরাণী এবং কুসুম উভয়েই ছুটিয়া সদর দরজার যাইয়া দেখিল—শচীন্দ্রনাথ রক্ত রঞ্জিত হইয়া ধূলিতে লুটাইতেছে।

শ্বশ্রূঠাকুরাণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। শচীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত দ্বারা মাতাকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিয়া পার্শ্বে মুখ ফিরাইয়া ডাকিল, "কুসুম।"

কুসুম স্থিরনেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল ; শচীন্দ্রনাথ কহিল, "মরণ বরণ করেও পিশাচের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে এসেছি। এ মরণে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই, বরং তুমি নিষ্কলঙ্কা জেনে মরতে পারছি বলে আনন্দে আনন্দধাম পাব। আমার অন্তরাত্মা আমায় জানিয়ে দিচ্ছে—তুমি দেবী। ক্রোধের বশে তোমায় অনেক দোষ দেওয়া হয়েছিল—ক্ষমা ক'রো!"

কুসুম স্বামীর হস্তদ্বয় চাপিয়া ধরিল। শচীন্দ্রনাথ কহিল, "কুসুম আর বেশী কথা বলতে পারছিনা, মাথায়—একটু হা—ত—"

শচীন্দ্রনাথ আর কথা বলিতে পারিল না। তাহার শেষ বাক্যের সহিত শেষ নিশ্বাসও বাহির হইয়া গেল।

শচীন্দ্রের মাতা আছাড়িয়া ক্রন্দনের রোল তুলিলেন। প্রতি-বাসিনীরা শীঘ্রই আসিয়া 'দোয়ার' ধরিল, কিন্তু কুসুম কাঁদিল না।

স্থিরনেত্রে মৃত স্বামীর মুখের পানে চাহিয়া পুনরায় ভাবিল,—

আর কেন! স্বামী!—রমণীর একমাত্র শোভন, সহায়, পালক! সেই স্বামী যা'র নাই তার আর কেন! যে স্বামী, স্ত্রীর প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ দিতে রোগ শয্যা ছেড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'রে, তা'র স্ত্রী আমরণ তারই সংসারে বসে কেমন ক'রে স্মৃতির দংশন সহ্য করবে! না, সে আর এ সংসারে প্রবেশ করতে পারবে না। ক্ষণপূর্ব্বে যে পথ সে বেছে নিয়েছিল, সে সেই পথই ধরবে। সে সেই অনন্ত পথে আবার তার স্বামীকে খুঁজে নেবে!

কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইল। একপদ অগ্রসর করিয়া দিয়াছে এমন সময় উচ্চ ক্রন্দনের শব্দে শচীন্দ্রের একমাত্র সন্তান কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "মি—নি থা—ব।" কুসুমের শুষ্ক চক্ষে ঝরণার ধারা বহিল। তাহার অনন্তপথে যবনিকা পড়িল—সে আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

কেরাণী

মাস কাবার।

পুলিশ-ব্যারাকের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিতে-ই জলধর পাল গৃহিণীকে তাগাদা দিয়া কহিলেন, "কৈ গো, তোমার যে নড়্‌তে-চড়্‌তেই সাতমাস! রোজ রোজ এ রকম ক'রে 'লেট' হলেই চাকরীর দফা হয়েছে!

"এই যে দিচ্ছি" বলিয়া কঙ্কালসার গৃহিণী হাঁড়ি হইতে দুই-চারি হাতা অর্দ্ধ-সিদ্ধ সফেন ভাত ও খানিকটা বেগুণ পোড়া থালায় সাজাইয়া দিয়া কহিলেন, "একটা মানুষ, কি করি বল? যাহোক ক'রে একটা যদি বাসন মাজা ঝিও থাকতো তাহলে আর এতটা অসুবিধে হ'ত না। তার উপর বলদেও কয়লা-ও'লার কাছে তিন্-তিনবার ছেলে পাঠালুম—ফিরিয়ে দিলে। তাদেরই বা দোষ কি? সাতমণের দাম তিনমাস ধরে বাকী! তবু যাহোক ছেলে গুলো 'নন্দীদের বাগানের কাঠ কুড়িয়ে এনেছিল!"

জলধর পাল গরম ভাতে ফুঁ দিয়া কোন ক্রমে নাকেমুখে গুঁজিয়া উঠিয়া পড়িলেন। শতচ্ছিন্ন সার্টটাকে চাপা দিয়া তাহার উপর মলিন ছিটের কোটটাকে চাপাইলেন। কাপড়ের জীর্ণ অংশের দিকটা কোঁচার দিকে টানিয়া পরিলেন। তার পর বুক-পকেটস্থিত

ট্রেনের 'মন্থলী-টিকিট'টা একবার দেখিয়া লইয়া যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় বাহির হইতে রসিক মুদি ডাক দিল, "জলধর বাবু বাড়ী আছেন।"

"আঃ জ্বালাতন কর্‌লে!" বলিয়া জলধর পাল পুত্রকে ইঙ্গিত করিয়া নিকটে ডাকিয়া চুপি-চুপি কহিয়া দিলেন, "যা বলগে, বাবা বাড়ীতে নেই—অফিস চলে গেছেন।"

পিতৃ-আদেশ সমাধান্তে পুত্র ফিরিয়া আসিয়া ক্রন্দনের সুরে কহিল, "গত মাসের স্কুলের মাইনে এখনও দিলেনা, বাবা? আজ না দিলে হেড্‌মাষ্টার নাম কেটে তাড়িয়ে দেবেন বলেছেন।"

জলধর পাল মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "এই মাস নিয়ে মোটে ত দু'মাস বাকী? আচ্ছা, সে হ'বে এখন,—আজ আর স্কুলে যাবার দরকার নেই।"

সারাদিন স্কুলের বন্ধন হইতে এবং হেড্‌-মাষ্টারের মাহিনার তাগাদা হইতে নিষ্কৃতি পাইল ভাবিয়া পুত্র মহানন্দে নাচিতে-নাচিতে চলিয়া গেল।

জ্যেষ্ঠা কন্যা ছুটিয়া আসিয়া পিতার দক্ষিণ হস্ত স-জোরে দুইকরে চাপিয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, "সুরেশ কাকার মেয়ের মত কল্‌কাতা থেকে আমার একটা জামা এনো না বাবা? গত বছর পূজোর সময় যে জামাটা দিয়েছিলে সেটা অনেকদিন ছিঁড়ে গেছে। আর আমার পর্‌বার একটাও জামা নেই।"

"অত ঘোরবার আমার কি আর সময় আছে পুটু ? দেখি পারি যদি চেষ্টা করবো।" বলিয়া কন্যাকে আশ্বস্ত করিয়া জলধর পাল ক্যাম্বিসের জুতাটা পরিতে গিয়া দেখিলেন যে, তাহা একে বারেই ছিঁড়িয়া গিয়াছে—কোন মতেই পায়ে লাগান যায় না। অগত্যা নগ্ন-পদেই বাহির হইতে হইল।

(২)

বাটী হইতে ষ্টেশনের দূরত্ব চার মাইল।

পথে মোটর-বাসের ও ছ্যাকড়া গাড়ীর ধুলা খাইয়া খানিক ছুটিয়া, খানিক হাঁটিয়া হাঁপাইতে-হাঁপাইতে জলধর পাল ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলেন,—ট্রেন সবেমাত্র ছাড়িতেছে। কুলীদের চীৎকার ও ষ্টেশন-মাষ্টারের ধমকানি সত্ত্বেও তিনি চলন্ত-গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। মস্তকে ও পদে কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

কোঁচাঘারা হাঁটু পর্য্যন্ত ধুলা ঝাড়িয়া একটা বেঞ্চে বসিয়া জলধর পাল কহিলেন, "কৈ হে, আজ যে তোমাদের এখন ও বসেনি দেখছি ?"

শচীন সরকার কহিলেন, "আরে তুমি মাষ্টার না এলে কখনও খেলা জমে !"

সুধীর দত্ত কহিলেন, "নাও, পরাণ, ঝাড়ন খানা পাত। এ দেখ্‌ছি, একটা দানও আজ শেষ হবে না।"

পরাণ বিশ্বাস চারিজনের কোলে ঝাড়ন খানি পাতিয়া পকেট হইতে তাসের প্যাকেটটা বাহির করিয়া দিলেন।

গোকুল পালিত, জলধর পালের নগ্ন পদ দেখিয়া কহিলেন, "কি দাদা, খালি পায়ে যে!"

জলধর পাল সসঙ্কোচে পদদ্বয় বেঞ্চের তলায় আরও একটু ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, "আর ভাই বল কেন। পুরুলিয়াতে মেজ-মামি মারা গেছে—সকালবেলা টেলিগ্রাম এসে হাজির! মাতুল-বংশ—না মান্‌লেও চলে না।"

"তাই নাকি!—তাহলে ত খুব বড় ভোজ লাগ্‌ছে?"

"লাগ্‌লে আর কি হ'বে—অফিসের ছুটী পেলে তবে ত যাওয়া?"

ভুপেন শীল গাড়ীর এক কোণ হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "মামা, তোমাদের ওখানে আজকাল ইলিশ মাছ না কি খুব সস্তা শুন্‌ছি?"

হাতের শেষ তাস খানি সজোরে ঝাড়নের উপর ফেলিয়া দিয়া জলধর পাল মুখ তুলিয়া কহিলেন, "সস্তা বলে সস্তা! আজ-ই ত সাত আনা দিয়ে দেড় সের একটা ডিমও'লা গঙ্গার ইলিশ নিয়ে এলুম। শালার যা তেল বেরিয়েছে,—তোমায় কি বল্‌বো ভাগ্নে!

—তা'তেই গোটা মাছটা ভাজা হ'য়ে গেল। আমি ত আজ ডাল-তরকারী ফেলে রেখে শুধু মাছ ভাজা দিয়েই ভাত খেয়েছি।"

সুধীর দত্ত গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "এই যে বল্লে তোমাদের অশৌচ হয়েছে! তবে আবার মাছ খেলে কি করে?"

জলধর পাল অপ্রস্তুত হইয়া তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আর্—রেখে দাও তোমার অশৌচ, তিনদিন অন্তর একজন ক'রে আত্মীয় মরবে, আর না খেয়ে পড়ে থাক,—হ্যাঁ! পায়ের জুতোটা খুলেছি এই ঢের!"

"নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই" বলিয়া গোকুল পালিত কহিলেন, "তা হলে, আসছে রবিবাব দিন দাদার বাড়ী ইলিশ মাছ খাবার নেমন্তন্ন, —কি বল দাদা?"

"সে ত সৌভাগ্যের কথা; সে বরাত কি আর করে এসেছি! তবে রবিবার দিন খুব সম্ভব আমি বাড়ীতে থাক্‌বো না।" বলিয়া উপন্যাস-পাঠরত মথুর বাক্‌চির প্রতি চাহিয়া জলধর পাল কহিলেন, "কি হে বাগ্‌চি, তুমি যে চুপ্‌-চাপ্‌ বসে আছ! কৈ পাওনাটা কৈ?"

টিনের টিফিন বাক্সের এক কোণ হইতে ব্যঞ্জন-মাখা একটা পান বাহির করিয়া দিয়া মথুর বাক্‌চি কহিলেন, "ভেবেছিলুম, দাদার অশৌচে বুঝি আজ আমার একটা পান বাঁচবে!"

"তা কি হয় বাবা!—এ যে আমার নিত্য-নৈমিত্তিক পাওনা, ফস্‌কালে চল্‌বে কেন? দাও পরাণ লাল-সুতোর একটা বিড়ি দাও? তোমাদের ওখানকার বিড়ি গুলো বাঁধে ভাল।"

ভূপেন শীল পুনরায় কহিলেন, "মামা, তোমার ও কোট্‌টা কি ধুতেও দেবেনা, ছাড়্‌বে ও না ? ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করা আরম্ভ থেকে এই দশ বছর-ই ত ওটাকে দেখে আস্‌ছি !"

"আরে এটা আমার রক্ষা-কবচ। পুরাণো হোক আর ছিঁড়েই যাক্, এটা না থাক্‌লে চাকরীর দফা এতদিন গয়া হয়ে যেত। এটা না প'রে একদিন অফিস গিয়ে যা ভোগাই ভুগেছিলুম, তা আমি-ই জানি ; সে আর শুনে দরকার নেই।"

"আরে দেত্‌তেরী, ওসব বাজে কথা যেতে দাও" বলিয়া শচীন সরকার পুনরায় তাস ভাঁজিতে আরম্ভ করিল।

(৩)

হাওড়া ষ্টেশন হইতে পদব্রজে অফিসে পৌছিতে অর্দ্ধঘণ্টারও অধিক সময় লাগিল। বড়বাবু চশমার উপর দিয়া চোখ বাহির করিয়া জলধর পালকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন, "ক'টা বেজেছে একবার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ দেখি ?"

"আজ্ঞে পৌনে-বারটা।"

"তা বেশ ; কদিন 'লেট' হল ?"

"আজ্ঞে, তা ঠিক মনে নেই।"

"এ আর ত আমি বরদাস্ত কর্‌তে পারি না।"

"আজ্ঞে আমার শুধু দোষ নেই—'থার্ড-বর্দ্ধমান'টা মাঝে মাঝে বেজায় দেরী করে—"

বড়বাবু চশমাটা কপালে উঠাইয়া কর্কশ স্বরে বলিলেন, "লেট্‌ কেবল তোমার একলারই হয়! এতগুলো লোক অফিসে চাকরী করে, তারা কি করে সময়ে আসে?"

"আজ্ঞে, তাদের মোটা মাইনে—অনায়াসে ট্রাম-বাসে যাতায়াত করে। আমার—"

"চাকরী রাখতে গেলে তোমারও তা করার দরকার বৈকি! কেন, রামদীন্ দারোয়ানটাও ত ৩০৲ টাকা মাইনে পায়,—সে কি ক'রে সময়ে হাজ্‌রি দেয়? আমি আর আস্কারা দিতে পারবো না, বাধ্য হ'য়ে বড় সাহেবকে আজই জানাতে হ'বে।" বলিয়া বড়বাবু চেয়ারটা একটু নাড়িলেন।

বড়বাবুর চেয়ারের পশ্চাতে তাঁহার তৃতীয় পক্ষের গৃহিণীর সহোদর দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এবং বড়বাবুর চেয়ার সঞ্চালনে জলধর পালের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইল তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ বোধ হয় ভূ-গর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে; বাকীটা শীঘ্রই ডুবিবে। তিনি আর কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সটান টেবিলের নিম্ন দিয়া বড়বাবুর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "বড়বাবু, আপনি আমার মা-বাপ; আপনার দয়াতেই চার-পাঁচটী কাচ্ছা-বাচ্ছা নিয়ে বেঁচে আছি। আপনার পায়ে পড়ি বড়বাবু, এবারকার মত আমায় ক্ষমা করুন।"

অফিসের অন্যান্য বাবুরা কর্ণে লেখনী গুঁজিয়া একবার করিয়া

বক্র-নয়নে এই 'গা-সওয়া' দৃশ্য দেখিয়া লইয়া পুনরায় পা দোলাইয়া আপন-আপন কার্য্যে মন দিলেন।

বড়বাবু শ্যালকের সম্মুখে আপন পদমর্য্যাদার গাম্ভীর্য্য দেখাইয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন, "খবরদদার, আর যেন এরকম না হয়। যাও, এবার তোমায় মাপ করা গেল।"

জলধর পাল নিমেষ মধ্যে আপন টুলটী অধিকার করিয়া কলম হস্তে মনে মনে বলিলেন, "বাবা তারকনাথ, তুমিই আছ! সেওড়াফুলী ষ্টেশনে উদ্দেশে যে রোজ কপাল ঠুকি সে কি বৃথাই যেতে পারে!"

দুপুরে শচীন সরকার ব্যস্ত হইয়া টিফিন-ঘরে আসিয়া কহিলেন, "মাষ্টার আজ যে সেই শিল্ড-টার ফাইন্যাল।"

"তাই নাকি?"

"হাঁ-হাঁ, মোহন-বাগান আর ইষ্ট-বেঙ্গল।—"

"তাহলে ত খুব contested—up and down game হবে।"

"নিশ্চয়ই—"

"যাচ্ছ নাকি?"

"সে আর বল্‌তে—আমি ত 'পয়ে-আকার' দেবই। তবে একলা গিয়ে তেমন ফ্‌র্ত্তি হয় না, মাষ্টার চল না?"

"যেতে ত খুবই ইচ্ছে, কিন্তু আজকে যে আবার মাইনের দিন ছাই! তার উপর শালা বড় বাবু যেন যক্ষের মত বসে থাকে!"

"আরে, তোমাদের বড়বাবু ত এইমাত্র কে একজন ছোক্‌রাকে নিয়ে অফিসের গাড়ীতে বেরিয়ে গেলেন।"

"তাই নাকি? তবে ত ভালই হয়েছে। মাইনেটা Draw করে চল এইবেলা তবে সরে পড়া যাক্‌।"

"তাহলে শীগ্‌গির এস, আমি 'গেটে' অপেক্ষা কর্‌ছি।" বলিয়া শচীন সরকার চলিয়া গেলেন।

(৪)

মাহিনার ৩০্ টাকা পকেটে ভরিয়া জলধর পাল ক্যালকাটা-গ্রাউণ্ডের নিকটে আসিয়া কহিলেন, "চল, কেল্লার দিকে গিয়ে দাঁড়ান যাক।"

শচীন সরকার বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "না, না রোজ রোজ ওখানে দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। আজ আবার ফাইন্যাল-ম্যাচ—দেখনা এখন থেকেই কত ভীড় লেগে গেছে। চারগণ্ডা পয়সার ত মামলা! চল-চল, ভেতরে গিয়ে ঢোকা যাক্‌।"

"ভেতরে—এ্যাঁ—ভেতরে?" বলিয়া টানিয়া-টানিয়া কথা বলিয়া জলধর পাল পকেট হইতে তিনখানি দশ টাকার নোট দেখাইয়া কহিলেন, "তবেই ত মাটী করেছে। আমার কাছে যে ছাই খুচ্‌রো পয়সা একটাও নেই—সবই নোট। তা কি করা যায়?" অদূরে পকেট-মার নোটগুলি দেখিয়া লইয়া মুচ্‌কিয়া হাসিল।

শচীন সরকার কহিলেন, "তোমার কাছে কি খুচ্‌রো পয়সা একদম নেই ?"

জলধর পাল নোটগুলি পুনরায় পকেটে পুরিয়া কহিলেন, "তা —তোমার কাছে কি চারগণ্ডা পয়সা বেশী হবে না সরকার ? থাকে যদি দিয়ে দাও,—কাল অফিসে এসে আবার না হয় ফেরৎ দেওয়া যাবে।"

কাঠের রেলিংয়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া টিকিট কিনিবার সময় পকেট-মার্ নিঃশব্দে জলধর পালের পকেট হইতে নোট তিনখানি তুলিয়া লইল। জলধর পাল তাহা আদৌ টের পাইলেন না, অনন্যমনে গ্যালারিতে গিয়া উপবেশন করিলেন।

পার্শ্বোপবিষ্ট জনৈক পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী ভদ্রলোক জলধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশয়, সবুজ আর লাল পিরেণ পৈরে যাঁরা খ্যাল্‌ছেন,—উহারা কোন্ দল বটে ?"

জলধর পাল হাসিয়া উত্তর দিলেন, "খেলা দেখ্‌তে এসেছেন মশাই,—মোহনবাগানের Uniform চেনেন না !"

"আমাকোর এহানে ঘর নয় মশয়, সেই কারণ জিজ্ঞাস্ কর্‌ছিলাম। বিপক্ষদল বোধ কর্‌ছি পূর্ব্ব-বঙ্গ হইবে ?"

"হাঁ, হাঁ," বলিয়া শীঘ্র উত্তর দিয়া জলধর পাল খেলা দেখিতে-দেখিতে মহা উত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "গো—গো—গো—গো—গো——অ—ঐ যাঃ !—দূর—দূর কোন কাজের নয় !

—দূর ক'রে দাও, দূর করে দাও মাঠ থেকে!—সট্—সট্—সট্—ফাউল!—ফাউল!—জোচ্চোর রেফারী,—জোচ্চোর রেফারী!—মারো—মারো শালাকে!"—বলিয়া উত্তেজনার বশে জলধরের মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তটী স-জোরে পার্শ্বস্থিত পূর্ব্ব-বঙ্গবাসীর নাসিকার উপর গিয়া পড়িল। তিনি স-ক্রোধে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, "মশয়, হালা কন, ফের আমাকো নাকে ঘা দেন্!"

জলধর পাল অপ্রতিভ এবং ভীত হইয়া কহিলেন, "মশাই, কিছু মনে করবেন না,—আমি আপনাকে ইচ্ছাসত্ত্বে মারিনি।"

"যান্ মশয়, আমি দুই দিন আসিয়ে কল্‌কেতার লোকরে উত্তম করিয়ে চিনে লইছি।" বলিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসী আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হাতের আস্তানা গুটাইয়া ঘুসি চালাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কলিকাতার নিয়মানুযায়ী একটা বিরাট কোলাহল সৃষ্ট হইয়া আশে-পাশেও রীতিমত মারামারি হইয়া গেল। পুলিশ আসিয়া দাঙ্গা থামাইয়া কতকগুলি লোককে থানায় চালান দিল।

শচীন সরকার দাঙ্গার প্রারম্ভেই মসী-জীবির কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে গ্যালারী হইতে লাফাইয়া বাহিরে পলাইয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাহার মাষ্টার রক্তাক্ত কলেবরে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাঠের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

মাষ্টারের অচেতন দেহ ট্যাক্সি করিয়া হাওড়ায় আনিয়া শচীন

সরকার পাঁচজনের সাহায্যে কোনক্রমে তাঁহাকে তাঁহার বাড়ীতে আনিয়া তুলিয়া দিলেন। জলধরের স্ত্রী এবং পুত্রকন্যার ক্রন্দনের শব্দে পাশের বাড়ীর 'পদি' পিসি ছুটিয়া আসিলেন। পরের দুঃখ-দুর্দ্দশায় 'আহা' করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যগ্র থাকেন, এবং পরনিন্দাপুরাণ না শুনিয়া তিনি কোনদিন জল-গ্রহণও করেন না।

অদ্যোপান্ত ঘটনা শুনিয়া 'পদি' পিসি কহিলেন,"এই সব গোরাদের খেলা খেলতে গেলে ত শুনেছি খেলোয়াড়দের হাত পা ভাঙ্গে, কিন্তু দেখ্‌তে গেলেও আজকাল ভাঙ্গে নাকি!"

ডাক্তার আসিল; রোগী দেখিয়া কহিলেন, "এঃ—এযে হাতছাড়া হয়ে গেছে! একটু আগেও যদি খবর পেতুম তাহলে লোকটা বেঁচে যেত। যাক্, তবে আজকের রাত্‌টা টিকে যেতে পারে। কৈ—আমার......" বলিয়া হাতটা কিছুক্ষণ পাতিয়া থাকিবার পর বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "দেরী করো না,—আমার ত আর একটা রুগী নয়, পাঁচ জায়গায় এখনও যেতে হবে।"

জলধরের স্ত্রী সজল নয়নে সকলকার মুখের দিকে একবার করিয়া তাকাইয়া অবশেষে 'পদি' পিসিকে কহিলেন, "পিসি, দু'টো টাকা ধার দাও না?"

'পদি' পিসি মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "আমারই বলে আজ চাল বাড়ন্ত;—আমি কোথায় পাব বাছা!" বলিয়া একটু মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন।

হঠাৎ জলধরের স্ত্রীর স্মরণ হইল—আজ যে মাস কাবার !—মাহিনার দিন ! তাড়াতাড়ি স্বামীর কোটের পকেট, সার্টের পকেট, কোঁচার খুঁট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দুইচারিবার করিয়া খুঁজিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন না।

তখনও ডাক্তার বাবু হাত বাহির করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া জলধরের স্ত্রী করযোড়ে মিনতি করিয়া কহিলেন, "ডাক্তার বাবু, বড় গরীব—ডাক্তার বাবু !"

ডাক্তার বাবু বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "সবাই যদি গরীব বলে, আমাদের চলে কোথা থেকে !"

'পদি' পিসি গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া কহিলেন, "তাই ত, তাই ত। —আহা ! বেচারা মরেও যাচ্ছে, পাঁচটাকে মেরেও যাচ্ছে ! কি দুর্ভাগ্য বল দেখি !—যাবার সময় এক পয়সা ঘাটের খরচও রেখে যেতে পারলি না বাপু !—একেই বলে কেরাণীর ভাগ্য !"

"জীবনে যত পূজা হলনা সারা—"

পিণাকি ও মঞ্জুষা উভয়ে উভয়কে ভাল বাসিয়াছিল, কিন্তু এই ভালবাসার প্রারম্ভটা কবে থেকে সেটা ঠিক মনে নেই,—কেননা, ভালবাসা জিনিষটা এমন একচক্ষু-বিশিষ্ট যে তার গণ্ডীর ভিতর থেকে অন্য কাহারও দিকে চক্ষু ফিরাইলেই সে তফাতে সরিয়া যায়। বাধ্য হইয়া অন্য সকলকার কথা তখন উভয়কেই ভুলিতে হইয়াছিল। বার, তিথি বা ডায়েরী খাতা তখন তাহারা চিনে নাই যে লিখিয়া রাখিবে। তখন পিণাকির বয়স আট, মঞ্জুষার পাঁচ।

তবে একদিনকার কথা পিণাকির আজও বেশ মনে পড়ে—যেদিন সে মঞ্জুষাকে তাদের ছাদের আলিসার উপর কপোত-কপোতীর নিবিড় প্রেমালিঙ্গন দেখাইয়াছিল। পিণাকি বলিল, "দেখ মঞ্জু, ওদের দু'জনের কত ভাব! ওদের এত ভাব বলেই ওরা সবচেয়ে সুখী।" মঞ্জুষা তখন কিছুই বোঝে নাই তথাপি কেন জানিনা সেইদিন হ'তেই তার মনের কোণে কোথাও একটু ফাঁক পেয়ে এক ঝলক আলো ঢুকে পড়েছিল। পিণাকিকেও প্রকৃত তখন রঙীন্ কল্পনা আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রেমের পথে আলাপন ছাড়া অতিরিক্ত আরও কিছু যে আছে, সে কথা তখনও তার মনে উদয় হয় নাই।

দিন যায়।

বাল্যরাগ আসিয়া পিণাকির উপর ঝাঁকিয়া বসিল। সে মঞ্জুষার কঠোরতাকে কোমল করিয়া দেখিল, ক্রন্দনকে সোহাগ ভাবিল, অভিমানকে দৃঢ় মিলন আকাঙ্ক্ষার পূর্ব্বাভাষ বলিয়া মনে করিল।

মঞ্জুষার চুলগুলিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিতে তাহার বড় ভাল লাগিত। যখন-তখন সে তার কচি আঙ্গুলগুলিকে মট্‌কাইয়া দিয়া আনন্দ অনুভব করিত।

পুষ্পোদ্যানে নিত্যই একঘেঁয়ে ফুল যেমন দৃষ্টিতে আর রস পরিবেশন করিতে পারে না, তেমনি প্রত্যহ একই প্রকার বস্ত্র পরিহিতা মঞ্জুষাকে পিণাকির কেমন দৃষ্টি-কটু লাগিত।

সে মঞ্জুষাকে বলিত—"মঞ্জু তোমার বাবার এত টাকা থাকতে তবুও তুমি রোজ রোজ একই কাপড় প'রে থাক কেন?" মঞ্জুষা কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে পারিত না। তবে পিণাকি উত্থাপিত কথাটি অন্ততঃ পিণাকির নিকট বজায় রাখিবার জন্য সে মাতার নিকট কান্নাকাটী করিয়াও মাঝে-মাঝে লট্‌কানে ছোবান কিম্বা খুন্‌-খারাপী রংয়ের কাপড় পরিয়া আসিত।

পিণাকি সজ্জিতা মঞ্জুষাকে দেখিয়া একটু বেশী আনন্দ উপভোগ করিত। বেশহীন মঞ্জুষাকে গ্রহণ করিবার শক্তি তখন তাহার ছিল না। মসি-লেপিত একবর্ণ চিত্র অপেক্ষা রঞ্জিত চিত্রই শিশুদের অধিকতর প্রিয়।

বাল্য-রাগের হাওয়া বহিলেও হৃদয়ে মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে

পিণাকি তখনও শিখে নাই। মঞ্জুষারও নিকট এসব বাল্য-লীলা। তাহার প্রতি পিণাকির সকল ব্যবহার-ই তার দৈনিক ক্রীড়ার একটা অংশ বলিয়া সে গ্রহণ করিত। রসবোধ অপেক্ষা সে বেশী উপ-ভোগ করিত—কৌতুহল।

মঞ্জুষার গঠনের উপর হইতে সৃষ্টিকর্ত্তার হস্ত অপসারিত না হইলেও মঞ্জুষা অনেক পরিমাণেই সৌষ্ঠব-সম্পন্না ছিল। তার চাহনি স্নিগ্ধ হইলেও চোখের কালো তারাদুটো অলসভাবে স্থির থাকতে পারতো না—অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে সাদা মাঠে ছুটাছুটি ক'রে বেড়াত। নয়নদ্বয়ের বিস্তৃতি আকর্ণ না হইলেও—হস্তী চক্ষু নয়, কপাল একরত্তিই বলতে হ'বে—গড়ের মাঠের তুলনা আসতে পারে না নাসিকা বংশী-সদৃশ অথবা খগ-নাসা-জয়ী না হইলেও 'চাইনিজি' নাক বলা যায় না। অধরৌষ্ঠ সংস্পর্শ শিহরণে রক্তিমাভ ন—স্বভাবতঃই পাকা বটফলের মত লাল ও কোমল। বর্ণ —পছন্দ সই।

নায়িকা কুরূপা বলিয়া পাছে তাহাকে কেহ অগ্রাহ্য করে এবং 'বসন খানি শাসন করে তোলা'র সময় পাঁচজনকে রূপ দেখান অসঙ্গত এবং তোমাদের নিকট দোষণীয় বলিয়া মঞ্জুষা বাল্যে-ই রূপ দেখাইয়া দিল। ভবিষ্যতে পরিবর্ত্তিত পূর্ণাঙ্গের রূপ দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে পাঠক-পাঠিকারা যেন কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করেন। তাহাকে লজ্জা দিবার প্রয়োজন নাই।

মরণোল্লাস

মঞ্জুষার পিতা ছিলেন সবজজ্। তখন মেদিনীপুর কি বাঁকুড়ায় ছিলেন সেটা ঠিক মনে নেই। তিনদিন অন্তর বদ্‌লীর জ্বালায় গাধাবোটের মত খুঁটিনাটি সংসারের যাবতীয় জিনিষ-পত্র পিঠে বোঝাই ক'রে ঘুরতে ঘুরতে মঞ্জুষার মা'র শরীর ভেঙ্গে প'ড়েছিল। তাই মঞ্জুষা জন্মাবার পরই, সহধর্ম্মিণী আখ্যা হ'তে নিজেকে বঞ্চিতা ক'রে তিনি স্বামীকে একলা মফঃস্বল-তীর্থে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ইতিপূর্ব্বে তাঁদের কল্‌কাতার বাড়ীটা একেবারে খালি ছিল। মঞ্জুষারা আসিতে আবার নূতন ক'রে তার রং এবং ঢং উভয়ই ফিরিল। মঞ্জুষার মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত সংসারের অনুপান এক বিধবা পিসীও এলেন।

মঞ্জুষাদের গলিতে একটা মেয়েদের স্কুল ছিল,—দিনে একবার ক'রে সেখানে মঞ্জুষাকে হাজ্‌রি দিতে হ'ত। বিদ্যার্জ্জনের মূলধন ছিল তার—একখানা ক্রেমখোলা শ্লেট্, একখানা মলাটহীন বিদ্যা-সাগরি বর্ণপরিচয়, একটুকরো শ্লেট্-পেন্‌সিল আর বেঙ্গল কেমি-ক্যালের কার্ব্বলিক টুথ্‌পাউডারের কৌটায় খানিকটা ভিজে ন্যাকড়া।

এই বিদ্যালয়ের পথেই পিণাকির সহিত তার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পরিচয়টা হয়েছিল একটু অস্বাভাবিকতার ভিতর দিয়ে। পিণাকি-দের বাড়ী ছিল ঠিক মঞ্জুষাদের পাশে। যেদিন মঞ্জুষা প্রথম স্কুল যাচ্ছিল তখন তার সঙ্গে ছিল একটা ঝি। পথে পিণাকি বন্ধুদের সঙ্গে খেল্‌ছিল—মার্‌বেল। মঞ্জুষার পায়ে লেগে তাদের একটা

মার্‌বেল ড্রেনের মধ্যে পড়ে যায়। সেটা তার ইচ্ছাসত্ত্বে কি অসাবধানতায় ঘটেছিল তা ঠিক বল্‌তে পারি না। যাই হোক্‌, সঙ্গে ঝি থাকায় ছেলেদের রাগটা সেদিন পিঞ্জরাবদ্ধ হ'য়েই রইল। পরদিন ঠিক এইসময় মঞ্জুষাকে একলা পেয়ে ছেলেদের প্ররোচনায় পিণাকি গুণ্ডামীর অভিনয় দেখিয়ে তার বর্ণ-পরিচয়খানা নিলে কে'ড়ে।

ফ্রি-প্রেসের সংবাদ পিণাকির পিতার কাছে পৌঁছিতে বেশী দেরী হ'ল না। তিনি পুত্রের কর্ণমর্দ্দনান্তে তাকে ক্ষমা ভিক্ষা করে মঞ্জুষাদের বাড়ী বই ফেরৎ দিতে পাঠিয়ে দিলেন।

পিণাকি ক্ষমা চাহিতে নারাজ। সে মঞ্জুষাদের বাইরের জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে বই-খানাকে ফেল্‌তে যাবে, এমন সময় মঞ্জুষাদের হিন্দুস্থানী চাকর এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল গিন্নিমার কাছে।

গিন্নিমা জিজ্ঞাসা করলেন—"হ্যাঁ বাছা, তুমি জান্‌লায় উঠেছিলে কেন?"

পিণাকি চালাক ছেলে, কহিল, "এই বইখানা অন্য আর এক-জন ছেলে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিলো—আমি তার কাছ থেকে আদায় ক'রে আপনাদের ফেরৎ দিতে এসেছি" বলে বইখানা মঞ্জুষার মার হাতে দিয়ে দিলে।

প্রেম-প্লাবিত বৈষ্ণব দেশে প্রমাণের আবশ্যক নাই—বিশ্বাসই মূল। মঞ্জুষার মাতা বালকের এবম্বিধ অযাচিত সহৃদয়তা দেখিয়া

কহিলেন, "আহা, খাসা ছেলে! তুমি রোজ এসে আমাদের মঞ্জুর সঙ্গে খেলা ক'রো।" পিণাকিরও একপদ ত্রি-রাগের প্রথম সোপানে স্থান লাভ করিল।

বালক-বালিকার ভবিষ্যৎ অন্ধকার জীবনের প্রলম্বমান সলিতায় প্রথম আগুন ধরাইয়া দিল—অভিভাবিকা, বালক-বালিকা নির্দোষ। পিণাকি-মঞ্জুষার এই শৈশব-মিলনের আমোদ কালে যদি সাংঘাতিক আমোদে পরিণত হয়, তজ্জন্য দায়ী মঞ্জুষার মাতা—না এই অবোধ বালক-বালিকা!

হঠাৎ একদিন মঞ্জুষাদেব বাড়ীর ছাদে কাঁচা বাঁশের মাচা বাঁধা এবং গো-শকটে হোগ্‌লার আমদানী দেখে পিণাকি মঞ্জুষাকে জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌লে—তার দিদির বিয়ে। পিণাকির মাতা-পিতা এ ভোজে নিমন্ত্রিত হউক আর নাই হউক সে অবশ্য এ ভূরি-ভোজনের নিকট ব্যবস্থা হইতে বাদ পড়িবে না জানিয়া মঞ্জুষার অলক্ষ্যে মনকে একবার নাচাইয়া লইল। মঞ্জুষার পিতা অনেক কষ্টে এক সপ্তাহের ছুটী মঞ্জুর করাইয়া 'গেজেটে'র 'লিভে'র ফর্দ্দে নাম উঠাইয়া বিবাহের ছ'দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় হাজির হ'লেন।

বিবাহের রাত্রে পিণাকির উপর জল পরিবেশনের ভার পড়িল। সে নির্ব্বিচারে জলের 'জাগ্' হস্তে রাত্রি বারটা অবধি ভদ্র-নিমন্ত্রিতগণ হইতে ব্যাণ্ডওয়ালাদের ব্যাণ্ড-বাহকের কাছ পর্য্যন্ত

ঘুরে মঞ্জুষার পিতার ভোজন দায়ের শেষ-রক্ষা করেছিল। অন্য যে কোন বিষয়েই হৌক্, পানীয়ের অনাটন সম্বন্ধে বরযাত্ররা কোনরূপ কুৎসা রটনা করিতে সাহস করে নাই।

যখন আর কাহারো কণ্ঠ ভিজাইবার দরকার রহিল না তখন পিণাকি অনুসন্ধান করিয়া বিশ্রামের জন্য একটা শূন্য ঘর খুঁজিয়া লইল, সেটা মঞ্জুষার পিতার ঘর। এমন সুসজ্জিত কক্ষে সে একা আধিপত্য করিতে কখনও পায় নাই. তাই আকাঙ্ক্ষাটা মিটাইবার জন্য সে সেই ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ছিল একটা ইজি-চেয়ার, একটা গড়্গড়া আর বিছানা-সমেত একটা খাট। পিণাকি নিঃশঙ্কচিত্তে দরজা ভেজাইয়া দিয়া, পাখা খুলিয়া ইজি-চেয়ারে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বাল্য-হৃদয়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার গতি যতদূর সম্ভব, পিণাকির চিন্তা ততদূর পর্য্যন্তই অগ্রসর হইয়াছিল। তার চিন্তা কল্পনা-রাজ্যের সীমান্তে গিয়া যখন ধাক্কা খাইল, তখন হঠাৎ গড়্গড়ার নলটার প্রতি তা'র দৃষ্টি পড়িল। কাল বিলম্ব না করিয়া সে কর্ত্তা ব্যক্তির অনুরূপে পায়ের উপর পা তুলিয়া, বক্ষে চিবুক স্পর্শ করাইয়া কিয়ৎক্ষণ গাম্ভীর্য্যের রূপ অনুকরণে ব্যর্থ হইয়া কলিকাশূন্য গড়্গড়ায় টান দিল—গুড়ুক্ —গুড়ুক্—গুড়ুক্।

সে শব্দ বিবাহ বাড়ীর কোলাহলে আর কাহারো কর্ণে পৌছিল না বটে, কিন্তু মঞ্জুষার ঘুম আঘাত খাইয়া মঞ্জুষাকে জাগাইয়া দিল।

সে যে এই ঘরেই শুইয়া ছিল তাহা পূর্ব্বে পিণাকির দৃষ্টি-গোচর হয় নাই।

কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া যখন অবাক্‌নেত্রে মঞ্জুষা পিণাকির দিকে দেখিতেছিল তখন 'দোসরে'র দৃষ্টিতে বিচলিত না হইয়া পিণাকি সপ্রস্তুত ভাবেই কহিল, "এই যে গিন্নি, এর মধ্যেই শুয়ে পড়েছ?"

ইতিপূর্ব্বে গৃহিণী সম্বোধন মঞ্জুষা কাহারো নিকট হইতে পায় নাই, তাই এত বড একটা পদবীদাতার প্রতি শ্রদ্ধায় তা'র মন ভরিয়া উঠিল। সে বলিল, "হাঁ, তুমি কখন এলে?"

সরলার সরল কণ্ঠের উত্তরে আশ্বস্ত হইয়া এবং মঞ্জুষাকে নিভৃতে নিকটে পাইয়া একটা প্রেমাভিনয়ের কল্পনা পিণাকির উর্ব্বর মস্তিষ্কে জাগিয়া উঠিল।

"আর ভাই গিন্নি, তুমি তো আর খোঁজ নাও না—" বলিয়া পিণাকি ধীরে ধীরে বিছানায় উঠিয়া মঞ্জুষার পার্শ্বে গিয়া বসিল। মঞ্জুষা একটু সরিয়া যাইতেছিল, পিণাকি তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "একি! কর্ত্তা কাছে এলে বুঝি গিন্নি সরে যায়?"

শ্রীল্ শ্রীযুক্ত কর্ত্তা পিণাকিভূষণ প্রণয়ের জ্ঞান অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিল, তাই সেটা অনভিজ্ঞা মঞ্জুষার নিকট যথাসাধ্য ব্যাখ্যান্তে কর্ত্তা-গিন্নির পালা আরম্ভ করিয়া দিল। পিণাকি কহিল, "গিন্নি, আর তো পারি না, সারাদিন সংসারের জন্য খেটে-খেটে কোমরে

ব্যথা হয়ে গেল ; কেউ একটু হাত বুলিয়েও দেয় না। আমি না বল্লেও কি ইস্ত্রির উচিত নয় স্বোয়ামীর সেবা করা !"

হাজার-হাজার ভাঁড়ে হেঁট হইয়া জল পরিবেশন করিয়া সত্য-সত্যই পিণাকির কোমরটা ব্যথা করিতেছিল।

মঞ্জুষার ক্ষুদ্র মুখে সে কথার উত্তর জোগাইল না। সে নিদ্রা-জড়িত চক্ষে যা' হোক করিয়া পিণাকির কোমরে হাত বুলাইতে লাগিল। ইতি মধ্যে কর্ত্তা-গিন্নিতে সংসার-ধর্ম্মের অনেকানেক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হইয়া গেল। সে কথা শুনিয়া আমাদের প্রয়োজন নাই, কেননা সে আলোচনা প্রতি নিয়ত আমাদের হাড়ে হাড়ে চলিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে কোমরে হস্ত-সঞ্চালনের গতি মন্থর অনুভব করিয়া পিণাকি ফিরিয়া দেখিল—মঞ্জুষা ঢুলিতেছে। এ সুখ-বাসরে মঞ্জুষা ঘুমাইয়া পড়িলে প্রেম-লীলার একটা অঙ্গহানি হয় ভাবিয়া পিণাকি তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "ওহো, একটা বড় কাজ আমাদের যে ভুল হয়ে গেছে !"

নিদ্রার তাড়নায় মঞ্জুষার শ্রদ্ধা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। সে কহিল, "আবার কি কাজ এখনও বাকী ?"

পিণাকি চট্ করিয়া বলিয়া দিল, "চুমু খাওয়া।"

মঞ্জুষা কহিল, "ধ্যাৎ।"

এ কাজটা প্রমাণ দর্শাইয়া বোঝান পিণাকির পক্ষে একটু

শক্ত। সে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কোন কল্পিত দৃষ্টান্ত জোগাড় করিতে না পারিয়া অবশেষে তাহার বাক্য-ই যে বেদবাক্য এবং কর্ত্তার কথা গৃহিণীর অবশ্য পালনীয় জানাইয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "এটা কি আর একটা নূতন কথা! যেখানে যত বর-বউ আছে সকলেই খায়।"

মঞ্জুষা মনে-মনে ভাবিল,—এ সমস্যার সমাধান করিতে তাহাকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে না। টাট্‌কা নূতন বর-বধূ যখন তাহাদের বাড়ীতেই, তখন কল্য দিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেই সে সব বুঝিতে পারিবে।

সে পিণাকিকে কহিল, "আচ্ছা, খেতে রাজী আছি, কিন্তু তোমার কথা যদি মিথ্যে হয়, তাহলে আর কখনও তোমার সঙ্গে কথা কইব না।"

"আচ্ছা তখন ক'য়োনা"—বলিয়া পিণাকি মঞ্জুষার মুখের সন্নিকটে নিজ মুখ অগ্রসর করিয়া দিয়া কহিল, "খাও।"

মঞ্জুষা একবার মুখটা বাড়াইয়া দিয়া পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়া কহিল, "না, লজ্জা করে।"

পিণাকি কহিল, "বরকে বুঝি বউয়ের লজ্জা করতে আছে!"

মঞ্জুষা মুখ নীচু করিয়া অস্পষ্ট স্বরে বিনাইয়া-বিনাইয়া কহিল, "আগে তুমি খাও, তারপর আমি খাব।"

মঞ্জুষার সদ্‌-যুক্তিতে অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিবার অবসর

“জীবনে যত পূজা হলনা সারা—”

আর পিণাকির হইল না। তাহার বহুদিন-বাঞ্ছিত এই অ-পূর্ব্ব-প্রাপ্ত মুখ-রোচক ‘চিজ্’টার আস্বাদ গ্রহণে সে আর এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিল না। তাহার পর মঞ্জুষাকে কহিল, “নাও, এইবার তোমার পালা ?”

মঞ্জুষা ইতস্ততঃ করিতে করিতে দুই-চারিটা ঢোঁক গিলিয়া পিণাকির ঘর্ম্মাভিষিক্ত নোন্‌তা গালে যে মুহূর্ত্তে আপন ঠোঁট দু’টী স্পর্শ করাইয়াছে অমনি কর্কশকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, “মঞ্জি !”

ক্ষণেকের জন্য উভয়েরই হৃদ্-স্পন্দন হঠাৎ থামিয়া গেল। মঞ্জুষা প্রথমে সভয়ে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল—স্ফীতলোচনা পিসিমা দ্বারে দণ্ডায়মানা।

মহাভারতের যুগ হইলে পাণ্ডু-রাজের মত এমন নিবিড় সুখা-বেশ ভঙ্গ করার দায়ে পিসিমাও যে অভিশপ্ত হ’তেন—সেটা নিঃসন্দেহ।

চুলের ঝুঁটী ধরে বিছানা থেকে নামাইয়া পিসিমা তো মঞ্জুষাকে টানিতে-টানিতে ঘরের বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। প্রত্যুৎপন্নমতি পিণাকিও আর অধিক সুযোগের অপেক্ষা করিল না,—একলম্ফে নিজেদের বাটীর দ্বারে হাজির।

(২)

কাল—দশ-বারোটা বছরকে গ্রন্থি দিয়ে শিকেয় তুলে ফেলেছে। এখন পিণাকি ও মঞ্জুষা উভয়েই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তক রোমন্থনে ব্যাপৃত ও ব্যাপৃতা।

পিণাকিদের একটু ইতিহাস দরকার।

তাদের আদি নিবাস ছিল—ভাটপাড়ায়। পিণাকির পিতা তত্রস্থ কোন চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করতেন, নাম—বিপিন চন্দ্র... তর্করত্ন কি বিদ্যারত্ন সেটা ঠিক মনে নেই। বছর ত্রিশ পূর্ব্বে খুব সম্ভবতঃ অর্থলোভে কলিকাতার কোন ধনীর বিধবা কন্যার বিবাহে পৌরহিত্য করায় তিনি নাকি সমাজ-চ্যুত হয়েছিলেন। ভাটপাড়া থেকে বিতাড়িত হ'য়ে তিনি কাঁটালপাড়ায় গঙ্গাতীরে আশ্রয় বেঁধেছিলেন, কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনা।—পাটকল ওয়ালাদের জমি জরিপের ফিতায় সে আশ্রয়টীও অবিলম্বে বাঁধা পড়লো।

নিরুপায়ের উপায় হরিকে স্মরণ করে নিরাশ্রয় —রত্ন মহাশয় যখন সপরিবারে উক্ত ধনীর শরণাপন্ন হ'য়ে বল্লেন, "এখন উপায় ?" তখন ধনী মহোপকারকের ঋণ স্মরণ করিয়া আপনার কলিকাতাস্থ একটী ভাড়াটিয়া বাটীর নিম্নতলার কিয়দংশ ছাড়িয়া না দিয়া আর করেন কি ?—তবে মাত্র —রত্নমহাশয়ের যাবজ্জীবন বাসের অজুহাতে।

"জীবনে যত পূজা হলনা সারা—"

পিণাকির জন্ম—এই বাটীরই একটা অন্ধকূপে।

মানুষ যে স্থানে জন্মায় সেই স্থানের আব্‌হাওয়াতেই তার প্রকৃতি গড়িয়া উঠে। পিণাকির পিতা পিণাকিকে 'শ্রুতি'-'স্মৃতি'তে ডুবাইয়া তাঁহারই মত একটী রত্ন গড়িয়া তুলিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সক্ষম হন নাই। 'সইভ্য-ভইব্যে'র যুগে পণ্ডিতি-জ্ঞানে মহত্বের কোন উপাদান নাই বুঝিয়া পিণাকি পিতার অনিচ্ছা-সত্বেও পারিবারিক দৌর্ব্বল্য অগ্রাহ্য করিয়া তথা-কথিত সভ্যশ্রেণী মধ্যে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় কৃত সঙ্কল্প হইয়াছিল

শোভাবাজারের 'তরুণ-ব্যায়াম-মণ্ডলী' হইতে খিদিরপুরের 'ছাত্র-নাট্য সম্প্রদায়' পর্য্যন্ত কোথাও তাহার যাতায়াতের বাধা ছিল না। ট্রামে-বাসে উঠিলে সকলেই তাহাকে—"এই যে পিণাকি বাবু!" বলিয়া নমস্কার করে।

সে দিন রবিবার।

ট্রামের মান্থলী টিকিট-খানা চেয়ে নিয়ে সারাদিন এধার-ওধার ঘু'রে 'ঝড়ো কাকের মত' যখন পিণাকি বেলা তিনটার সময় বাড়ীতে এসে ঢুক্‌লো, তখন তা'র মা বল্লেন, "হ্যাঁরে, কুস্তি-থিয়েটার ক'রেই কি পেট ভর্‌বে?"

পিণাকি মাতার বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া বলিল, "সে সব আমি জানিনা;—বড় ক্ষিদে পেয়েছে, এখন খেতে দাও।"

মাতা ক্ষুধাতুর পুত্রের সম্মুখে শশব্যস্তে বাড়া-ভাতের থালা

আনিয়া দিলেন। পুত্র খাইতে আরম্ভ করিলে মাতা কহিলেন, "পিণাক্, একটা কথা বল্‌বো শুন্‌বি ?"

"কি ?"

মাতা আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "এই একটা বিয়ে-টিয়ে —"

"বুঝ্‌তে পেরেছি,—আমার বিয়ের জন্যে তো বল্‌ছ ?"

আনন্দোৎফুল্ল মুখে মাতা বলিলেন, "হাঁ বাবা, বিয়ের উপযুক্ত বয়স হ'ল তো ?—তাই বল্‌ছিলুম, এখন আর বিয়ে না কর্‌লে কি ভাল দেখায় ?"

"তা তো জানি, কিন্তু লেখা পড়া কর্‌তে হ'বে, না—বিয়ে করেই আমার দিন কেটে যাবে ?"

"না, তা' বলিনি, এই বারের পাশটা দিতে তো তোর আর ছ'মাস বাকী ? তারপরে—"

"তা' সে তো এখনও দেরী আছে।"

"আহা কথাবার্ত্তাগুলো ত সব আগে থেকে ঠিক কর্‌তে হ'বে ?"

"কা'দের সঙ্গে ঠিক কর্‌ছো ?"

বিবাহের প্রস্তাবে এইবার বুঝি পুত্রকে সম্মতি করাইতে পারিলেন ভাবিয়া মাতা কহিলেন, "খাসা মেয়েটী বাপু,—তোর সঙ্গে যা মানাবে।"

"মেয়েটী কে তাতো শুনলুম না ?"

মাতা দশমুখে বর্ণনা আরম্ভ করিলেন,—"মেয়েটি বাগবাজারের বিত্তেলঙ্কারের মেজ মেয়ে। বিত্তেলঙ্কারের মত পয়সাওলা লোক কি আর আমাদের জাতে খুঁজে পাওয়া যায় ? আশী ঘর তার যজমান ! কল্‌কাতা সহরেই তা'র তিন-তিনখানা বাড়ী। বিয়ে হলে পরে আমাদের একটা হিল্লে হয়ে যাবে। দেখছিস্ তো কি ক'রে মাথা গুঁজে সব আছি—'হুট্' কর্‌লেই উঠ্‌তে হ'বে। অত বড়লোক, বিয়ে হলে কোন্ না একখানা বাড়ী-ই জামাইকে দেবে ! তা'হলে একটা শুভদিন দেখে কিছু দিয়ে মেয়েটা আট্‌কে রাখা যাক্—কি বল্ ?"

"মেয়েব বয়স কত ?"

"তা' আমাদের জাতে কেউ দোষ দিতে পার্‌বে না যে একটা ধেড়ে মেয়ে এনে হাজির করেছে। সবে এই সাতে চল্‌ছে, গৌরীদান কর্‌বার জন্য বিত্তেলঙ্কারের একান্ত ইচ্ছে।"

মাতার কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণান্তর পিণাকি ভ্রূ-দ্বয় কুঞ্চিত করিয়া কহিল,"দেখ মা,তোমরা লোকের কাছে আগে কথা দিয়ে বৃথা অপমানিত হ'য়ো না। আমি ত আপাততঃ বিয়ে কর্‌বো-ই না ঠিক করেছি, যদি কখনও করি সে নিজের পছন্দমত, কারণ যার সঙ্গে চিরকাল ঘর কর্‌তে হ'বে তাকে নিজে পরখ করে নেওয়াই ভাল। তোমরা হয়ত এখন যা' হোক দেখে একটা জুড়ে দেবে

তারপর তোমাদের অবর্ত্তমানে নিজের অবিবেচনার ফলভোগ কর্‌তে হবে—সেই আমাকে। তাই তোমাদের বারণ করে দিচ্ছি—অনর্থক চেষ্টা ক'রো না।"

এস্রাজের টানা-মীড় শ্লথ হইয়া গেল। আপনাদিগের দারিদ্রের কথা স্মরণ করিয়া পিণাকির মাতার নয়ন কোণে অশ্রু দেখা দিল। ভবিষ্যতের সুখ এবং বর্ত্তমান দুঃখের দ্বন্দ্বে পড়িয়া তিনি আর একবার পুত্রকে নম্র-ভাবে কহিলেন, "নিজেদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখিস্—পিণাক্!"

পিণাকির দায় পড়িয়া গিয়াছে। দিবসের বিশ ঘণ্টা কাল বাহিরের আনন্দ-কোলাহলে কাটাইয়া দুঃখ চিন্তা করিবার অবসর আর তাহার কোথায়! মাতার অশ্রুজল দর্শনে সুখের কল্পনা-ক্ষেত্রে আবাদ বন্ধ হইতে পারে ভাবিয়া পিণাকি মাতার দিকে না চাহিয়া-ই উঠিয়া গেল।

* * * *

"হ্যালো, গুড্-ইভনিং।"

"এই যে মঞ্জুষা!—তোমার কাছেই যাব ব'লে ভাবছিলুম।"

"ওঃ! মাই গুড্-লাক্—তাই নাকি! সকালে যে বল্লে দুপুরে আস্‌ব—খুব তো এলে?"

"সে জন্য—বেগিং পার্ডন্, মঞ্জুষা।"

"কেন দুপুর-বেলা কি হয়েছিল?"

"বিশেষ কিছু হয়নি" বলিয়া পিণাকি পকেট হইতে একটা 'ব্রুচ্' বাহির করিয়া মঞ্জুষার কাপড়ে আট্‌কাইয়া দিল।

মঞ্জুষা বলিল, "এ আবার কোথা থেকে পেলে?"

পিণাকি নিউ-মার্কেটের একটা দোকানের বিল বাহির করিয়া কহিল, "ওঃ, এই দেখনা—সারা দুপুর এইটার জন্যে ঘুরে বেড়িয়েছি।"

মঞ্জুষা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, "কি দরকার ছিল?"

"সে যাক্‌গে,—আজ একটা নূতন কথা আছে বলবো। সেটা শুন্‌লে নিশ্চয়-ই হাস্‌তে-হাস্‌তে তোমার দম আটকে যাবে।"

সন্ধ্যার কালো-পর্দ্দা ধীরে-ধীরে কলিকাতাকে জড়াইতে আরম্ভ করিল। কোজাগরী-পূর্ণিমার জ্যোৎস্না উপভোগের আশায় উভয়ে-ই ত্রি-তলের ছাদে উঠিল।

মঞ্জুষা কহিল, "কি নূতন কথা বল্‌বে বল্‌ছিলে—এইবার বল।"

পিণাকি মঞ্জুষার উভয় স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিল, "শুন্‌বে?—শুন্‌বে?—আমার বিয়ে।"

"যাও, চালাকি ক'রো না।"

"বিশ্বাস কর্‌ছ না?—সত্য-সত্যই বল্‌ছি। মা বা'দের বাড়ীতে একটা হুর্‌ব্রী শুলির মত মেয়ে দেখে এসে আমায় ধরে বসেছেন—বিয়ে কর্‌তে হ'বে।"

"তুমি কি বল্‌লে ?"

"আমি আমার বাঁধা-গৎ আউড়ে দিলুম"

"ঠিক বল্‌ছো—তুমি রাজী হওনি ত ?"

"মঞ্জুষা, তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর ! যে প্রাণ একবার উৎসর্গিত হয়ে গেছে সে প্রাণ কি আর কাউকে দেওয়া যায় ?"

পিণাকির গলায় বাহুর মালা পরাইয়া দিয়া মঞ্জুষা কহিল, "না, সে কথা আমি বলিনি, তুমি আমায় মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাস তা আমি জানি ।"

পিণাকি আবেগে মঞ্জুষাকে বাহু-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া কহিল, "মঞ্জুষা, এমনি বন্ধনে যেন চিরকাল আমরা বাঁধা থাক্‌তে পারি ।"

"নিশ্চয়-ই থাক্‌বো । আমাদের এখনকার এই পূর্ব্বরাগ দ্বারা আমাদেব ভবিষৎ জীবন-বন্ধন যে অধিকতর দৃঢ় হ'য়ে উঠ্‌বে তা কি তুমি জান না ? যে লতা বাল্য হ'তে বিটপীতে জড়ান তা'র শিকড় যে বিটপীর প্রত্যেক শাখায়-শাখায় গেঁথে যায়,—শত প্রলয়ের ঝটিকাতেও সে ত ভূলুণ্ঠিতা হ'বার নয় ।"

পিণাকি নিঃশব্দে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "সেটা তোমার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর কর্‌ছে । আমায় বাধা দেবার কেউ নেই বটে, কিন্তু তোমার বাধা বহু ।"

"আমার আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশটাকে তারা বাধা দিতে পারে, কিন্তু মনোভাব ত তারা দমন কর্‌তে পার্‌বে না ।"

"তোমার অন্তর্নিহিত ঐ মনোভাবটুকু বজায় রেখো মঞ্জুষা।—ওর দ্বারাই আমাদের ইচ্ছা নিশ্চয় পূরণ হ'বে।" বলিয়া পিণাকি মঞ্জুষার গণ্ডস্থলের কিয়দংশ লাল করিয়া দিল।

ত্রি-তলের ভাড়াটিয়ার অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র-কন্যা ছাদে খেলা করিতেছিল, ভাড়াটীয়া গৃহিণী স-রোষে ডাক দিলেন, "ওরে ভোঁদা, রাণু,—ওখান থেকে শিগ্‌গির ঘরে চলে আয়।"

(৩)

মানুষের গানের সহিত ভগবানের তাল সমান ভাবে যেতে পারে না, অধিকাংশ স্থলে-ই কেটে যায়। দ্বৈত-চাঞ্চল্য দোলায় দোদুল্য মানুষের মন প্রথমাবস্থায় অনুতাপ করে, পরিশেষে অদ্বৈত-জ্ঞানে পরিতাপে জর্জ্জরিত হয়। শরতের নির্ম্মল-আকাশ দেখে মনে হয়, চিরকাল-ই বুঝি এইরূপ থাকবে, কিন্তু আষাঢ়ে কোথা থেকে কালো মেঘ ঠিক এসে হাজির হয়!

পিণাকির পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছে। ফলাফলের আশায় কয়দিন উদ্‌গ্রীব হইয়া সে ছুটাছুটী করিয়া খবর পাইল—পরীক্ষায় সে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

এই অকৃতকার্য্যের জন্য বাড়ীতে তাহাকে দু'কথা বলিতে কেহ সাহস করিবে না, বলিলেও তাহা তাহার পক্ষে তত পীড়াদায়ক নয়। কিন্তু যখন তা'র ভাবী বধূ মঞ্জুষা একথা শুনিবে তখন——!

পিণাকি বাটীতে ফিরিয়া আত্মগত কহিতে লাগিল, "মঞ্জুষাকে কেমন করিয়া মুখ দেখাইব? সে কি আর তেমন করিয়া আমায় ভালবাসিতে পারিবে।"

ধীরে-ধীরে মঞ্জুষার সরসিজ-সদৃশ মুখ পিণাকির নয়ন সরোবরে ফুটিয়া উঠিল। সে মুখ-জ্যোতিঃ পরিপার্শ্বস্থ অন্ধকার দূরে সরাইয়া দিল। অতীত-সুখ-স্মৃতি-শিখা নির্ব্বাণোন্মুখ বর্ত্তমানে ইন্ধন লাগাইয়া পিণাকিকে পুনরায় ভাবাইল,—ভালবাসা ত বাহিরের জিনিষ নয়। প্রণয়িণীর নিকট প্রণয়ীর শত অপরাধ যে মার্জ্জনীয়,—দোষ ত তারা দেখিতে পায়না এবং দেখিতে চায়-ও না। বিরহিণী নিত্য-বিরহের জ্বালাতে-ই ত জর্জ্জরিতা, অন্য কিছু ভাববার ত তার অবসর নাই। তৃষ্ণার্ত্তের দৃষ্টি ত উপাদেয় ভোজ্যে নয়,—পানীয় অভিমুখ্য। না, মঞ্জুষা তাহাকে কখনই হীন চক্ষে দেখিতে পারেনা। যদি দেখিত, তাহা হইলে তাহাদের দারিদ্র্যাবস্থা দর্শনে সে পূর্ব্বেই আভিজাত্য-গর্ব্বে ফিরিয়া দাঁড়াইত। অর্থে, গুণে সৌজন্যে, রূপে ত ভালবাসা নয়,—ভালবাসা যে মনের সংযোগে। এক অদৃশ্য-সূত্র যে ভালবাসাকে বেঁধে রাখে,—সে ত ছিন্ন হ'বার নয়!

সেই চাঁদিনী রাতের নিরালা ছাদে মঞ্জুষার মনোভাব ব্যক্তের কথা পিণাকির মনে পড়িল। প্রাণ তার ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

বাহিরের দরজার নিকট আসিয়া পিণাকি মঞ্জুষার নিকট

যাইবার চিন্তা করিতেছে, এমন সময় মঞ্জুষাদের সরকার আসিয়া তাহার হাতে একখানি লাল খামে মোড়া চিঠি দিয়া গেল। পিণাকি বন্ধ খামখানি দু'একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। সে ঠিক করিতে পারিল না যে, মঞ্জুষাদের বাটী হইতে কোন্ শুভ-বার্ত্তা-জ্ঞাপক পত্র আসিতে পারে! সংশয়ের ছায়া তা'র মনোমধ্যে উঁকি মারিতে লাগিল। সেটাকে সে সবলে অপসারিত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু নাছোড়-বান্দা যা'বার নয়,—ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই এককথাই তোলে! এ কি জ্বালা!—এত করিয়া সে বলিতেছে—না, তবু বলিবে—হাঁ! যদি সত্যি-ই তাই হয়, হৃদয় ও আঘাত ত সহ্য করিতে পারিবে না!—চিঠি খুলিয়া দরকার নাই।

কিন্তু চিন্তালোড়িত বিক্ষুব্ধ মন যে সংশয় দোলায় দুলিতে চাহে না, সিদ্ধান্ত যে তার চাই। চিঠি খুলিয়া গেল, তা'তে লেখা :—

আগামী ৬ই বৈশাখ রবিবার শিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রকান্তের সহিত আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মঞ্জুষাবালার শুভ-পরিণয় হইবে। অতএব মহাশয় উক্ত দিবসে সবান্ধবে মদীয় ভবনে শুভাগমন করতঃ শুভ-কার্য্যাদি সুসম্পন্ন করাইবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম, ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

বশম্বদ—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

চিঠিখানি সম্পূর্ণ পিণাকি পড়িতে পারিল না। ভাদ্রের পুষ্করিণীর মত কাণায়-কাণায় অশ্রু ভরিয়া চোখ তার ঝাপ্‌সা হইয়া গেল। অলক্ষ্যে চিঠিখানি তাহার হাত হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেল।

সে ভুল দেখে নাই ত। সে ঘুমাইতেছে—না, জাগিয়া আছে? জাগিয়া আছে বৈ কি!—এই তো সে কপাটে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া। পুনরায় সে চিঠি উঠাইল, ভাল করিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া আবার পড়িয়া দেখিল। না, তার দৃষ্টি বিভ্রম বা চিত্তবিকার তো হয় নাই,—ঠিকই দেখিয়াছে। সত্যই মঞ্জুষার বিবাহ।

পিণাকি চিঠিখানা লইয়া আপনার ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গেল। সে যতই চিন্তা করিতে থাকে, অন্ধকার ততই যেন ঘনাইয়া আসে। ব্যথিত হৃদয়ের সমস্ত আক্রোশ তা'র যাবতীয় গৃহসামগ্রীর উপর পড়িল। একটু সান্ত্বনার আশায় সে যে দিকে তাকায় সেই দিকই যেন তাহাকে অট্টহাস্তে বিদ্রূপ করে। গৃহে পাঠ্য পুস্তক, চৌকী ছবি, কুঁজো, থালা, ঘটি, তোরঙ্গ, পেটরা,—সবই যেন অঙ্গুলি সঞ্চালনে তা'র জীবনের ব্যর্থতাকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছে। মঞ্জুষার এই চাতুরীতে বিশ্বের নারীর প্রতি তাহার ঘোর বিদ্বেষ জন্মাইল,—সমগ্র সংসারটাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে হইল। একখানা পুস্তকের মধ্য হইতে মঞ্জুষার একটা ফটো বাহির করিয়া তৎপ্রতি একবার কটাক্ষপাত করিয়া সেটাকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া

দিয়া, নিমন্ত্রণ পত্র হইতে '৬ই বৈশাখ রবিবার' কথাটি সে একটুকরা কাগজে টুকিয়া লইয়া পকেটস্থ করিল।

বস্তুতঃ এ বিষয়ে মঞ্জুষার কোন দোষ ছিল না। দেবেন বাবু কোনসূত্রে এই গুপ্তপ্রণয়-ঘটিত ব্যাপারের আভাষ পাইয়া মর্ম্মাহত হইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক কষ্টের পর শিবপুরের নূতন সাব-ডেপুটি শ্রীমান্ চন্দ্রকান্ত বাবাজীবনকে পাইয়া অনেকটা আশ্বস্ত হইলে, মঞ্জুষা অনেক আপত্তি তুলিয়াছিল; এমন কি পিতৃকবল হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিষপান প্রভৃতি দ্বারা জীবলীলা সাঙ্গ করিবার ভীতিপ্রদর্শনও করিয়াছিল। কিন্তু পিতার কড়া পাহারায় কিছুই টিকিল না। দেবেন বাবু স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—পিণাকির সহিত তাহার বিবাহ কোন মতেই হইতে পারে না।

* * * *

মঞ্জুষার বিবাহের দিন।

চারিদিকে হট্টগোল, গাড়ীঘোড়া, ভিয়ানের ধূম লাগিয়া গিয়াছে। নবনির্ম্মিত নহবৎখানা হইতে সানায়ের সুর উঠিতেছে, আর সে সুর আগুনের হল্কার মত ছুটিয়া পিণাকির সর্ব্বাঙ্গে যেন ফোস্কা করিয়া দিতেছে।

মাতার তাগিদে পিণাকি পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া, সিল্কের চাদর ঝোলাইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে বাহির হইল, কিন্তু মঞ্জুষাদের দ্বারদেশের সম্মুখস্থ হইয়া আর প্রবেশ করিতে পারিল না।

সেইস্থান হইতেই সে দেখিতে পাইল—ঠাকুর দালানে হোমাগ্নি জ্বলিতেছে এবং তৎসম্মুখে উপবেশন করিয়া একটি রূপবান্ যুবক মঞ্জুষার পট্টবস্ত্রের অবগুণ্ঠন উঠাইয়া সীমন্তে সিন্দুর লেপিয়া দিতেছে।

পিণাকি আর চাহিতে পারিল না। তাহার মনে হইল যে, সে জোর করিয়া গিয়া ঐ লাল সিন্দুরটা মুছিয়া দিয়া আসে, কিন্তু মাথা বিগড়াইয়া লাভ?

চন্দ্রকান্তকে দেখিয়া তাহার মনে হইল—কেন ভগবান চন্দ্রকান্তকে ঐরূপ রূপ দিয়া এই অসময়ে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। যদি ভুল করিয়াই তাহাকে পাঠান হইয়া থাকে, তবে জন্মিয়াই কেন সে মরে নাই।

পিণাকির আর অধিকক্ষণ এস্থানে দাঁড়াইয়া থাকা উচিত নয়। এ উত্তেজনাকে বশ করা মানুষের সাধ্য নয়। আমারকে তোমার হইতে দিতে পিণাকি ত পারিবে না;—হয়ত এখনি কিছু অনর্থ ঘটিবে।

তবে উপায়?—উপায় আত্মস্থ হওয়া। পিণাকি নিমেষে মুখ ফিরাইল। তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, মাতা-পিতা ঘর-বাড়ী, যাহা কিছু সমস্তই পিছনে পড়িয়া গেল, আর ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা হইল না। সম্মুখে দেখিল—বিশাল অনন্ত!—তাহাতেই পা বাড়াইল।

"জীবনে যত পূজা হলনা সারা—"

গৈরিকবস্ত্র পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক পিণাকি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে কাশীতে এক সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বারো বৎসর ধরিয়া বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ্-সাংখ্য-দর্শন প্রভৃতি চর্চ্চা ও অনুশীলনের পর সন্ন্যাসী তাহাকে জন্মভূমি দর্শনার্থ আজ্ঞা করিলেন। পিণাকি পুনরায় কলিকাতার পথ ধরিল।

এতদিন সাধু-সংশ্রব এবং শাস্ত্রালোচনার মধ্যে থাকিয়া জগতের সমস্ত পদার্থের সহিত পিণাকি আপনাকেও হারাইয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতার পথে বিস্মৃত পূর্ব্ব স্মৃতির সহিত পুনরায় মঞ্জুষার প্রতিচ্ছবিও তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠিল।

কেন এমন হইল? স্মৃতি কি এতই স্বার্থপর—যার প্রভাব একটা যুগের সাধন ব্যর্থ করিয়া দেয়! কে ইহার উত্তর দিবে? —মন?

পিণাকি আপন মনের নিকট প্রশ্ন করিয়া জানিল—তা'র দেহ গৈরিক বস্ত্রে আবৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু মনের কাপড় এখনও যে তার পরিবর্ত্তিত করা হয় নাই।—মনেরও গৈরিকাচ্ছাদন প্রয়োজন।

যাক্, কলিকাতায় আসিয়া পিণাকি তাহাদের বাসা-বাড়ীটি খুঁজিয়া পাইল না। অনুসন্ধানে জানিল,—তাহা ধূলিসাৎ করিয়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট নূতন রাজপথ নির্ম্মাণ করিতেছে। অগত্যা তাহাকে সন্ধ্যার পর নিমতলা ঘাটে গঙ্গাতীরে শয়ন করিয়া থাকিতে হইল।

মরণোল্লাস

রাত্রি বোধ হয় তখন বারোটা হইবে , হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে পিণাকি দেখিতে পাইল,—জলের খুব সন্নিকটে বসিয়া জনৈকা স্ত্রীলোক নাকিস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে অপর একজন শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা যুবতীর সিঁথির সিন্দূর উঠাইয়া দিতেছে। কৌতূহলাক্রান্ত পিণাকি তাহাদেরই জনৈক পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা,—দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর কন্যা ; নাম,—মঞ্জুষা। বিবাহ হওয়া অবধি সে শ্বশুরালয়ে যাইতে চাহিত না , জোর করিয়া পাঠাইয়া দিলেও পলাইয়া আসিত। আজ টেলিগ্রাম পাইয়া জানা গেল—জামাইবাবু বৈকালে গতায়ু হইয়াছেন।

পিণাকি আর শুনিতে চাহিল না। সে "বম্ বম্" শব্দে দিগ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া বলিল,—"বিশ্বনাথ ! অবিমৃষ্যকারিতায় বাল্যরাগ ও পূর্ব্বরাগের প্রকৃত মূল্য না বুঝে তা' নিয়ে চিরদিন ছিনিমিনি খেলেছি, কিন্তু আজ যখন তোমার বিচিত্র ইঙ্গিত দিয়ে তা' বুঝিয়ে দিলে, তখন আমার এ জীবনের শেষ সম্বল 'অনুরাগের ডালি' আজ তোমার চরণেই সম্পূর্ণ সমর্পণ ক'রে ধন্য হ'লুম।"

পাগল

সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের দরিদ্র নগণ্য হিন্দুস্থানী হয়েও রামদীন্ বাঙ্গলায় এসে নিজের চতুর্দ্দিকে ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যের খনি খুঁজে নিয়েছিল—যেদিন বছর-বছরের সাগ্রহ-প্রতীক্ষা সফল ক'রে সরলার শূন্য কোল পূর্ণ হ'ল।

সুষমা জন্মাবার পূর্ব্বে রামদীন্ নিজেকে মূল্যহীন্ বলেই মনে ক'র্‌ত। সারা দিনমান সে একটা না একটা কাজে লেগেই থাক্‌ত,—চুপ ক'রে বসে থাক্‌তে তাকে খুব কমই দেখা গেছে। দিনান্তে এত কাজ ক'রেও সে যেন তার কাজের সমাপ্তি খুঁজে পেত না—তৃপ্তিও হ'ত না।

রামদীনের বয়স প্রায় তিন-কুড়ির উপর হবে। ত্রিশ বছর বয়সেই তার স্ত্রী-পুত্র সব মারা যায়; কেবলমাত্র একটী আট বছরের মেয়ে তাকে আরও কিছু দিন তার মুলুকে মায়ার বাঁধন দিয়ে আট্‌কে রেখেছিল। সেটীও কেড়ে নিয়ে ভগবান যখন তাকে পথ দেখিয়ে দিলে তখন সে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে সরলার বাপের কাছে এসে জুটেছিল।

সরলার বিবাহের সময় শ্বশুর-দত্ত অন্যান্য যৌতুকের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ রামদীন্‌টিকে পেয়েছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে এসে পর্য্যন্ত রামদীন্ সমস্ত কাজ সুচারু-রূপে এবং সুশৃঙ্খলভাবেই ক'রত, কিন্তু সুষমা জন্মাবার পর থেকে তা'র সব কাজেই যেন একটা শৈথিল্য এসে পড়েছিল। এজন্য সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাকে মাঝে মাঝে তিরস্কার সহ্য কর্‌তে হ'ত, কিন্তু সেগুলো সে গায়ে মাখ্‌তো না।

দিনের মধ্যে তেইশ-ঘণ্টা তা'র সুষমাকে নিয়েই কাটুতো। তাকে হিন্দুস্থানী ধরণে কাপড় পড়ান, হিন্দি বুলি শেখান—এই গুলোই যেন তার কাজ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল।

সুষমারও ছিল যেন রামদীন্ অন্ত-প্রাণ।

সুষমাকে পেয়ে রামদীন্ তার অসমাপ্ত কাজের সমাপ্তি খুঁজে পেলে বটে, কিন্তু অতৃপ্ত মন তা'র তৃপ্ত হ'ত না—আরও কিছু চাইছিল। সে সুষমাকে সামনে রেখে তার সঙ্গে ত্রিশ বছর পূর্ব্বেকার মুল্লুকের কতকগুলো ছবি মেলাবার চেষ্টা কর্‌তো, কিন্তু মিল্‌তো না। সে ছবি মেলাতে এখনও দু'বছর অপেক্ষা কর্‌তে হবে, সুষমা এখন সবে ছয়।

(২)

দিনরাত চাকরের ঘরে বসে থেকে হীন মনোবৃত্তি শিক্ষা দোষণীয় মনে করে সুরেন্দ্রনাথ সরলাকে ডেকে বল্‌লেন, "বাড়ীর সব কাজেই

কি আমাকে চোখ রাখ্‌তে হ'বে? মেয়েটাকে কি একটু নজরে রাখ্‌তেও পার না? একটা মেয়ে,—তাও যদি না পাব, পাঁচটা হ'লে কি কর্‌তে? ও রকম ভাবে চাকরদের ঘরে সুষমাকে আর যেতে দিও না।"

সরলা হাসিয়া উত্তর দিলেন, "রামদীন্ তোমার কাছে চাকর হ'তে পারে বটে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওর যে একটা আলাদা সম্বন্ধ আছে। ও তো আর আজকের নতুন চাকর নয়,—সুষমার প্রতি ওর ও যে একটা মস্ত দাবী আছে। শুধু সুষমা কেন—আমিও যে তার হাতে মানুষ।"

সুরেন্দ্রনাথ বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "ও সব বুঝিনা। ভদ্রলোকের মেয়ে যাতে ভদ্রভাবেই গড়ে উঠে তার চেষ্টা কর্‌তে হ'বে। একটা হিন্দুস্থানী 'মেড়ো'র কাছে আমার মেয়ে কোন মতেই মানুষ হ'তে পারে না।"

সরলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, "তাহলে আমাকেও তোমার গ্রহণ করা উচিত হয়নি। রামদীনের কাছে আমিও যখন মানুষ হয়েছি তখন আমিও ত অমানুষ, অভদ্র।"

সুরেন্দ্রনাথ কোন উত্তর দিলেন না, গুম্ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সরলা স্বামীর একান্ত নিকটে সরিয়া আসিয়া মৃদু-স্বরে কহিলেন, "দেখ, মানুষ হ'য়ে অত কঠোর হ'য়ো না। সন্তানের পিতা হ'য়ে

সন্তান যে কি জিনিস সেটা একটু বুঝে দেখ্‌বার চেষ্টা ক'রো দেখি? সেদিন রামদীন্‌ যখন তার নিজের মেয়ের গল্প করতে করতে কেঁদে ফেল্‌লে,—তখন সুষমার মুখটা কি তোমার একবারও মনে পড়ে নি? তুমি কি মনে করছ যে সে পেটের জ্বালাতেই শুধু এইখানে চাকরী করছে? সুষমাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলে এই বুড়ো বয়সে সে কি আর বাঁচ্‌বে? তুমি বোধ হয় জাননা যে সুষমার অনিষ্টে আমাদের অপেক্ষা সে আরো বেশী বেদনা বোধ করে!"

সুরেন্দ্রনাথ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "তার বোধ-অবোধে কিম্বা তার মরণ-বাঁচনে আমার কি এসে যায়?"

সুরেন্দ্রনাথের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া সরলা হঠাৎ স্নেহের সহিত কহিলেন, "তোমরাই না আজকাল দেশ উদ্ধার করতে ছুটেছ? তোমরাই না পরাধীন, পরনির্ভর, পর-পদদলিত জাতির ক্ষুধা মেটাবার চেষ্টা করছ?"

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "হাঁ, করছি,—তা' এর সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি?"

"সম্বন্ধ যথেষ্ট। নিজের ঘরের মধ্যে একজন পরাধীনের মরণ-বাঁচন যখন তোমরা গ্রাহ্যের মধ্যে আন্‌তে পার না, তখন সমগ্র পরাধীন জাতিকে তোমরা কোন্‌ শক্তি দিয়ে বাঁচাবে তা তো জানিনা! ভিতরের সংস্কার আগে শেষ কর, তারপর বাইরের

কাজে হাত দিও।" সুরেন্দ্রনাথ সরলার মুখের প্রতি নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সরলা বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "স্বাধীনতা হারিয়ে অন্যান্য স্বাধীন দেশ দেখে তোমাদের যেমন স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা জেগে উঠেছে, ঠিক তেমনি কন্যা হারিয়ে কন্যালাভের আকাঙ্ক্ষায় আজ রামদীনের হৃদয়ও ভরপূর। তাই সেও পরাধীনতারূপ মহা অপরাধ স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছে—তার বহুদিন সঞ্চিত অপত্যস্নেহ উৎসর্গ ক'রে একদিন মুক্তি পাবার জন্য। তার প্রবাহমান স্নেহ-স্রোত একদিন পথের মাঝে আটুকে গিয়েছিল আজ সেই স্রোত আবার পথ খুঁজে পেয়েছে। তাকে বাধা দেওয়া কি উচিত ?"

সুরেন্দ্রনাথ অন্য-মনস্ক হইয়া রহিলেন, উচিত-অনুচিত চিন্তা করিতে লাগিলেন কিনা জানিনা।

(৩)

আজ সুষমার অষ্টম-বার্ষিক জন্মদিন।

সরলা কন্যাকে নূতন শাড়ী পরাইয়া গলায় ফুলের মালা দোলাইয়া দিলেন, মুখে চন্দন দ্বারা চিত্র বিচিত্র আঁকিয়া দিলেন। তাহার পর তাহার বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ দন্ত দ্বারা কামড়াইয়া তাহারই ললাটে স্পর্শ করাইয়া দিয়া রন্ধন-শালায় পায়স পাক করিতে চলিয়া গেলেন।

রামদীনের কিন্তু সুষমার এ বেশ দেখিয়া পছন্দ হইল না। সে তাহাকে আপন ঘরে লইয়া গিয়া তোরঙ্গ খুলিয়া হিন্দুস্থানী লাল শাড়ী বাহির করিয়া পরাইয়া দিল ; সোণার গহনাগুলি খুলিয়া তৎপরিবর্ত্তে রূপার মোটা মোটা বালা, হাঁসুলী ইত্যাদি পরাইয়া দিয়া নিভৃতে ছাদে লইয়া গেল।

সরলা তাহাদের পদশব্দ পাইয়া রন্ধন-শালা হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, "দেখো রামদীন, ন্যাড়া ছাদ—খুব সাবধানে থেকো।"

রামদীন্ ছাদ হইতে তাচ্ছিল্যস্বরে কহিল, "তোমার যে আজ বেশী মায়া পড়ে গেছে দেখছি, দিদিমণি। এদিকে তাকাবার ত তোমার দরকার নেই—আপনার কাজে মন দাও।" বলিয়া সুষমাকে আপন ক্রোড়ে বসাইয়া বারংবার তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, "রামদীন্, মা বল্‌ছিল যে তোমার একটা আমার মত মেয়ে ছিল,—সত্যি ?"

রামদীন্ বিহ্বলনেত্রে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর কহিল, "হুঁ,—ছিল।"

"তার জন্যে তোমার মন কেমন করে না ?

রামদীনের দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। ঝাপ্‌সা চোখে সুষমার মুখের উপর সে যেন আপন কন্যার মুখের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইল। অস্ফুটে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল—"না"।

রামদীনের চক্ষে জল দেখিয়া সুষমা হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?—সে কোথায় ?

রামদীন্ সুষমাকে সবলে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, "তুই আমার এইখানেই ত রয়েছিস্—কোথাও যাস্‌নি ত ?"

এ কথাটা সুষমার মনঃপূত হইল না। সে কোন মতে রামদীনের হাত ছাড়াইয়া চিবুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ঠেকাইয়া 'আড়ি' 'আড়ি' করিতে করিতে এক পদ এক পদ করিয়া পিছাইতে লাগিল।

রামদীন আপনাকে হারাইয়া, পরিপার্শ্বস্থ সমস্ত বিশ্বটা হারাইয়া এক দৃষ্টে সুষমার দিকে চাহিয়া রহিল। সুষমা যত দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল সে তত স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ভাবে আপন কন্যার রূপ সুষমার সর্ব্বাঙ্গে দেখিতে লাগিল। হয়ত দু'একবার তাহার কন্যার হিন্দুস্থানী নামটাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল।

পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে সুষমা যখন ছাদের শেষ সীমায় আলিসার অত্যন্ত নিকটে গিয়া পৌঁছিয়াছে তখন রামদীনের চেতনা হইল। সে ছুটিয়া তাহার নিকট যাইবার পূর্ব্বেই সুষমা আর একপদ পিছনে বাড়াইয়া দিয়া দ্বিতলের ছাদ হইতে একেবারে নীচে পড়িল।

'হৈ' 'হৈ' করিয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। কেহ চোখে, কেহ মুখে জল ছিটাইতে লাগিল, কেহ বাতাস করিতে লাগিল, কিন্তু চিরজন্মের মত সে চক্ষু মুদিত হইয়া গেল—আর খুলিল না।

সুরেন্দ্রনাথ ক্রোধে উন্মত্তের ন্যায় মার-পিট করিয়া অর্দ্ধ-মৃতাবস্থায় রামদীনকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন।

(৪)

বছর পাঁচ ছয় কেটে গেছে।

সুরেন্দ্রনাথের বাটীর দক্ষিণ দিকে খানিকটা জমি আবহমানকাল ধরিয়া পড়িয়া আছে। শীতকালের সকালে মিষ্টি-মিষ্টি রৌদ্রের আশায় পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা প্রত্যহই সেইখানে এসে আড্ডা জমায়। পুরুষ-পরম্পরা ধরে এ আড্ডার কখনও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

'বিধু', 'জ্যোতি' 'কল্পনা', 'ভূতো' প্রভৃতি ছেলে-মেয়েরা কেহ পকেটে, কেহ আঁচলে করিয়া 'কুসুমবীজ' দেওয়া মুড়ি আর খানিকটা করে পাটালি গুড় নিয়ে আজ সকাল-সকালই 'ডাং গুলি' 'বাঘ-বন্দী' 'মারবেল ইত্যাদি খেলা আরম্ভ করে দিয়েছিল।

খেলিতে-খেলিতে হঠাৎ কল্পনা পূর্ব্বদিকে তাকাইয়া শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, "পাগল! পাগল!"

জ্যোতি জিজ্ঞাসা করিল, "কৈরে কৈ?"

কল্পনা হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিল, "ঐ দেখ্ না বাব্‌লা গাছের গোড়ায় বসে রয়েছে।"

বিধু বলিল, "তুই কি ক'রে জান্‌লি—ও পাগল?"

কল্পনা কহিল, "দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌ না, ও কি রকম ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। পাগল না হ'লে কেউ কখন জঞ্জাল গাদায় এসে অমনি ক'রে বসে থাকে?"

ভূতো কহিল, "না, রে না, ও পাগল নয়, পাগলরা কি চুপ ক'রে বসে থাকে। পাগলরা ত লাফালাফি ক'রে বেড়ায়।"

জ্যোতি ভূতোকে ধমক দিয়া কহিল, "হ্যা, তুই বড্ড জানিস। পাগল বুঝি কখনও এক রকমের হয়? পাগল কত রকমের হয়;— কেউ হাসে, কেউ কাঁদে কেউ মারামারি করে, আবার কেউ কেউ চুপ্‌চাপই বসে থাকে—কা'রো সঙ্গে কথাও কয় না।"

অল্পবুদ্ধি কল্পনা পাগলের তত্ত্ব-বিশ্লেষণে মন দিতে পারিল না। কহিল, "আহা বোধ হয় ওর শীত করছে, তাই ঐ রকম জড়সড় হয়ে বসে আছে। দেখছিস্‌ না ওর গায়ে কিছু নেই, খালি একটা পাত্‌লা জামা,—তাও আবার ময়লা, ছেঁড়া।"

সহানুভূতিটা বাল্য হতেই বালিকাদের হৃদয়ে যেমন করিয়া জাঁকিয়া বসে, বালকদের বুঝি তেমন বসে না। জ্যোতি সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, তাই তাচ্ছিল্যভাবে কহিল, "দূর, পাগলরা বুঝি শীত-গ্রীষ্ম বুঝতে পারে। সারাদিন পাগলামো করাই ওদের কাজ। খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্তও ওদের মনে থাকে না।"

কল্পনা জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, ওর কি কেউ নেই?"

"কি জানি থাকতেও পারে।"

কল্পনা কহিল, "তাহলে তারা ওকে দেখে না কেন ?"

"দেখে বৈকি ; না দেখ্‌লে ও না খেয়ে কখনও বেঁচে থাকতে পারে !"

মানুষকে মানুষ দেখিলে কখনও একজনের ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে না ভাবিয়া কল্পনা দয়ার্দ্রস্বরে কহিল, "আমার ভাই ওকে দেখে মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ও অনেকদিন হয়ত খেতে পায়নি। চল্‌না ওর কাছে দু'টো মুড়ি দিয়ে আসি, বোধ হয় খেতে পারে ?"

জ্যোতি দন্ত বিকশিত করিয়া কহিল, "ওঃ, তুই যে বড় দাতা হয়ে গেছিস্‌ ! তোর ইচ্ছে হয় তুই যা। শুধু শুধু ওকে মুড়ি দেবার জন্যে আমাদের দায় পড়ে গেছে।" বলিয়া পুনরায় 'বাঘ-বন্দী' খেলায় মন দিল।

নির্মম জ্যোতির শ্লেষ-বাক্য শ্রবণ করিয়াও পাগলের প্রতি অষ্টম বর্ষীয়া কল্পনার ক্ষুদ্র হৃদয় হইতে বালিকা-জন-সুলভ মমতা বিদূরিত হইল না। সকলেই আপন-আপন খেলায় মন দিল, কিন্তু সে খেলিতে পারিল না—উন্মনা হইয়া পাগলের দিকে তাকাইয়া রহিল। একবার তার নিকটে গিয়া তার পাগল-জীবনের দু'টো বিচিত্র ইতিহাস শুনিবার জন্য কল্পনার প্রাণ ব্যাকুল হইতে লাগিল। কিন্তু সাহস করিয়া পাগলের নিকট একলা যাইতেও তাহার ভয় করিল।

জ্যোতির পার্শ্বে গিয়া কল্পনা মিনতি স্বরে পুনরায় কহিল,

"জ্যোতি চল্‌না ভাই ? আমি একলাই যেতে পারতুম কিন্তু ভয় কর্‌ছে।"

জ্যোতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "তোর জন্যে আমি গিয়ে মার খাই আর কি !"

কল্পনা স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "সকলে মিলে গেলে মার কেন খাব ভাই ? আর ও তো চুপ্‌চাপ্‌ বসেই আছে,—কাউকে ত কিছু বলেনি। চল্‌না জ্যোতি—যাবি ? যদি যাস্‌, তাহলে কাল দাদার বাক্স থেকে তোকে একমুঠো মার্‌বেল এনে দেব।"

এইবার জ্যোতি লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, "সত্যি বল্‌ছিস দিবি ?"

কল্পনা কহিল, "হাঁরে—সত্যি।"

জ্যোতি কহিল, "তিন-সত্যি কর।"

কল্পনা তিনবার 'দোব, দোব, দোব' বলিয়া শপথ করিল।

অপ্রত্যাশিত লাভের এবং পাগলের সহিত আমোদ করিবার প্রত্যাশায় জ্যোতি সকলকে ডাকিয়া বলিল, "চল্‌ যাওয়া যাক।"

পাগলটা কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছে কেহই তাহা জানে না। রংটা তার খুব যে কাল—তা নয়। সাদা চুলগুলো সব উস্কো-খুস্কো ধুলো-মাখা, মুখে একমুখ দাড়ি। কপালের, গালের, নাকের চামড়াগুলো সব শ্লথ হ'য়ে ভাজ প'ড়ে প'ড়ে গেছে, আর তার মধ্যে বহুকালের ধুলো জমে জমে এমন বীভৎস দাগের সৃষ্টি

হয়েছে যে সহসা দেখলেই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। চোক দুটো তার ঘোলাটে, মনে হয় যেন ভাটার মত বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে। গায়ে তার মাপের চেয়ে বড় একটা সার্ট, পরিধানের কাপড়টা শত ছিন্ন,—স্থানে স্থানে গ্রন্থি দিয়ে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত যাহোক ক'রে আবৃত ক'রে রেখেছে। হাত-পায়ের নখগুলো প্রায় আধ-ইঞ্চি করে লম্বা হয়ে গেছে। পায়ের গোড়ালী দু'টো যেন 'ফুটী-ফাটা'র মত চৌচির।

ছেলেরা দল বাঁধিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কল্পনা আরো একটু নিকটে অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিল, "এই তুই পাগল?"

পাগল কোন উত্তর দিল না; অর্থহীন উচ্চহাস্য করিয়া থামিয়া গেল।

কল্পনা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তোর বাড়ী কোথায়?"

পাগল অঙ্গুলি নির্দ্দেশে অদূরে বনের দিকে দেখাইয়া দিল।

কল্পনা কহিল, "তোর কেউ নেই?"

পাগল সজল চক্ষে ধীরে ধীরে একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'না!" পরক্ষণেই একমুখ হাসিয়া বারংবার কহিতে লাগিল, "হাঁ—হাঁ, আছে—আছে"

কল্পনা তাহাকে মুড়ি দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোর ক্ষিদে পেয়েছে?—মুড়ি খাবি?"

পাগল তাহার শীর্ণ হাত দুটী কল্পনার দিকে বাড়াইয়া দিল। কল্পনাও আর স্থির থাকিতে পারিল না,—চুম্বকের আকর্ষণ যেন তাহাকে টান দিল। সে আঁচল খুলিতে খুলিতে যন্ত্র-চালিতের মত পাগলের সন্নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র পাগল দুই হাতে কল্পনাকে জড়াইয়া বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিল।

ছেলেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া আপন-আপন বাড়ীর দিকে ভয়ে ছুটিয়া পলাইল।

গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল—গ্রামে 'ছেলেধরা' ঢুকিয়া কল্পনাকে লইয়া পলাইয়াছে। ছেলেরা ভয়ে আর কেহই বাহির হইতে চাহিল না।

*　　*　　*　　*

কল্পনার পিতা এবং অন্যান্য গ্রামবাসীরা অনেক অনুসন্ধানের পর পাগলের সন্ধান পাইল—সুরেন্দ্রনাথের বাটীর দ্বারে।

সকলেই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—সরলা কল্পনাকে একহাতে ধরিয়া অন্যহাতে পাগলের মাথায় ধীরে-ধীরে হাত বুলাইতেছেন।

পাগল বিকট বদন-ব্যাদন করিয়া বারংবার কহিল, "আমি সুধিকে খুঁজে পাব না, একি কখনও হয়, দিদিমণি!"

চক্ষের জলে সরলার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল, তথাপি করুণ হাসি হাসিয়া কহিলেন,"রামদীন্—আজ তোর এই অবস্থা!"

কুলী

তখন রাত্রি বারোটা।

লুপ্‌লাইনের শেষ ট্রেণ খানি 'হু' 'হু' শব্দে রহমতপুর ষ্টেশন পাস করিয়া চলিয়া গেল।

রামকিষণ সিগ্‌ন্যাল কেবিনে চাবি লাগাইয়া গৃহোদ্দেশে মুখ ফিরাইতেই দেখিল—সম্মুখে একজন তদ্দেশীয় যুবক দাঁড়াইয়া! সাহসে ভর করিয়া নিজ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

লছমন দুইপদ অগ্রসর হইয়া আসিয়া লোটা ও কম্বল-জড়ানো বিছানাটা ভূমিতে রাখিয়া তাহার উপর ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "আমার নাম লছমন।"

রামকিষণ তাহাকে চিনিতে পারিল না।

লছমন জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম ত রামকিষণ কাহার?"

রামকিষণ বিস্মিত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমাকে কেমন ক'রে চিন্‌লে? তোমার বাড়ী কোন্ জিলায়?"

লছমন কহিল, "আরা জিলায় রামনগরে আমার বাড়ী।"

রামকিষণেরও বাড়ী ঐ গ্রামে। সে আজ প্রায় আঠার

বৎসর বাঙ্গালায় আসিয়া রেলে চাকুরী করিতেছে। ইতিমধ্যে দেশে যাইবার তাহার একবারও অবসর হয় নাই। সাগ্রহে পুনরায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় বল্‌লে?—রামনগর!"

লছমন কহিল, "হাঁ, আমি আপনার সহোদর হই। আপনি কি আমার নাম চিঠিতে শোনেন নি?"

রামকিষণ কহিল, "কৈ না!"

লছমনের নাম না শুনিবার এবং তাহাকে না জানিবার কারণ যথেষ্ট ছিল। আঠার বৎসর পূর্ব্বে যখন সে বিবাহ করিবার পরই দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল তখন লছমনের জন্মই হয় নাই। প্রথম প্রথম যদিও তাহার মাতা এবং স্ত্রী তাহার সংবাদাদি লইবার জন্ম দেশ হইতে মাঝে-মাঝে পত্র লিখিত, কিন্তু এতাবৎকাল টাকা পাঠাইবার ভয়ে রামকিষণ সে সকল পত্রের কোন উত্তর দেয় নাই এবং তাহাদের খোঁজ লইবারও কোন চেষ্টা করে নাই।

যাহা হোক, দুই-চারিটী কথা-বার্ত্তার পর কতকগুলি বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাইয়া লছমনকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে তাহার আর দ্বিধা রহিল না।

রামকিষণ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার খাওয়া-দাওয়া বোধ হয় কিছু হয়নি?"

লছমন কহিল, "না, সকালে ট্রেণ থেকে নেমে অবধি আপনাকে খুঁজ্‌তে-খুঁজ্‌তেই সময় কেটে গেছে।"

"ওঃ তাই নাকি। তবে ঘরে চল,—কথা-বার্ত্তা পরে হবে"—বলিয়া রামকিষণ বিছানা ও লোটাটা নিজেই উঠাইয়া ভ্রাতাকে লইয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইল।

(২)

রামকিষণ গৃহে প্রবেশ করিতেই সঞ্চারিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও আবার কে?"

রামকিষণ কহিল, "ও আমার ভাই হয়,—আজই দেশ থেকে এসেছে।"

সঞ্চারিয়া বলিল, "তোমার যে দেশে ভাই ছিল, কৈ সে কথা ত একদিনও আমায় বলনি!"

সঞ্চারিয়ার জন্ম বাঙ্গালা দেশেই। স্বামী গত হইবার পর হইতে দুইটী পুত্র লইয়া প্রায় দশ বৎসর কাল ধরিয়া সে রামকিষণের সহিত স্বামী-স্ত্রী রূপে একত্র বসবাস করিয়া আসিতেছে। রামকিষণের মুখে সে পূর্ব্বে শুনিয়াছিল যে রামকিষণ অবিবাহিত এবং দেশে তাহার মাতা ভিন্ন আপনার বলিতে আর কেহ নাই। কিন্তু আজ হঠাৎ একজনকে ভ্রাতা বলিয়া আপনার করিয়া লইতে দেখিয়া সে হতাশ হইয়া গেল। উপরন্তু, অবথা সংসার বৃদ্ধির ভয়ে এবং আপনার জনকে পাইয়া পাছে তাহাদের প্রতি মমতা হ্রাস হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় সঞ্চারিয়া ক্রোধান্বিতা হইয়া কহিল,

"এ রকম মিথ্যে কথা বলবার কি দরকার ছিল? আগে জান্‌লে আমি কখনই তোমার কাছে এসে পড়্‌তুম না।"

রামকিষণ তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া কহিল, "আরে, আমিও কি চাই জানি! এখন শুন্‌ছি যে ও আমার ভাই হয়।"

সঙ্কারিয়া কহিল, "তাহলে এইবার সত্যি ক'রে বল দেখি, দেশে তোমার আর কে কে আছে?"

রামকিষণ আত্মবিহ্বল হইয়া কহিল, "বাঙ্গলায় আস্‌বার সময় দেশে মা ভিন্ন সত্যি আমার আর কেউ ছিল না।"

"কেউ ছিল না তো এখন তোমার ভাই এল কোথা থেকে?"

রামকিষণ জেরায় থতমত খাইয়া কহিল, "আহ, আমি দেশ থেকে চলে এলে পর ওর জন্ম হয়েছিল।"

ইহা সত্য কথা।

সঙ্কারিয়া মনে মনে ভাবিত সে একাই বুঝি দুশ্চরিত্রা। সে ভিন্ন আর অন্য সকলেই বোধ হয় সতী। তাই সে এতদিন নিজেকে ছোট করিয়া এবং লুকাইয়া রাখিবারই চেষ্টা করিত। কিন্তু এখন বুঝিল যে জগতে দোষহীন সংসার খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

ছোট্ট একটী "তা বেশ" উত্তর দিয়া সঙ্কারিয়া চলিয়া যাইতেছিল, রামকিষণ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "আরও এক-জনকার খাবার তাহলে করতে হবে যে? ছেলেটাকে দিয়ে আর পোয়া তিন আটা তাহলে আনিয়ে নাও।"

সঞ্চারিয়া কহিল, "এখন আর উনানে আগুন কোথা ? রান্না-বান্না ও বেলাই সব শেষ করে রেখেছি। পোয়াটাক ছাতু আনিয়ে দাও না।"

রামকিষণ জিভ্ কাটিয়া কহিল, "রাম ! রাম !"

সঞ্চারিয়া কহিল, "কেন, ছাতু কি অখাদ্য ?"

"না, না তা বলিনি। তবে ভায়ের সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা। যদি সে দেশে ফিরে গিয়ে আমার মায়ের কাছে, আমার স্ত্রীর—" বলিয়াই রামকিষণ থামিয়া গেল।

এতদিন সঞ্চারিয়াকে রামকিষণ যে প্রতারণা করিয়াই আসিয়াছে তাহা সঞ্চারিয়া একদিনেই বুঝিয়া লইল। কোনরূপ ভাববৈলক্ষণ্য না দেখাইয়াই সে কহিল, "তোমার স্ত্রী নিন্দে করবে—এই ত ?'

রামকিষণ তাড়াতাড়ি কহিল, "আরে না—না—না,—আমার স্ত্রী কেন হবে ! আমি ত—"

সঞ্চারিয়া কথা চাপা দিয়া বিদ্রূপ সহকারে হাসিয়া কহিল, "বুঝেছি, বুঝেছি—আর বলতে হবে না। আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।" বলিয়া রুটীর ব্যবস্থা করিতে চলিয়া গেল।

(৩)

আহারান্তে রামকিষণ ও লছমন বাহিরে দুইখানি খাটিয়ায় শুইয়া দেশের কথা পাড়িল।

রামকিষণ জিজ্ঞাসা করিল, "মা কেমন আছে ?"

লছমন কহিল, "মা ?—মা আজ মাসখানেক হল মারা গেছে"।

"এঁ্যা" বলিয়া রামকিষণ খাটিয়ার উপর লাফাইয়া বসিয়া নাকি স্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল। মিনিট পাঁচ ছয় পরে নাক ঝাড়িয়া লইয়া আপনার স্ত্রীর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল।

লছমন আপন মনে কি একটা ভাবিয়া লইয়া কহিল. "বৌদি ?—"

"হাঁ" বলিয়া রামকিষণ প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় তাহার দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল।

"বৌদি গো!—ওঃ—হো—হো—হো—"বলিয়া লছমন বিকটস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। রামকিষণ তাড়াতাড়ি ভ্রাতার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া কহিল, "একটু আস্তে আস্তে কাঁদ ভাই। তোমার বৌদি'র খবর বাড়ীর ভেতর গেলে আমার আর রক্ষা থাকবে না।"

লছমনের ক্রন্দনের স্বর কমিয়া গেল। রামকিষণ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে সেও কি আর নেই ?"

লছমন কহিল, "না, তিনি মারা যাননি , তবে—"

রামকিষণ ঢোক গিলিয়া লইয়া কহিল, "যাক্ বাঁচা গেল,—মরেনি তাহলে ? কিন্তু আবার 'তবে' কি ?"

লছমন কহিল, "বছর দুই আগে তাঁর একটী সুন্দর ছেলে হয়েছিল।—"

"এ্যাঁ!—ছেলে?" বলিয়া রামকিষণ বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে লছমনের দিকে চাহিয়া রহিল।

লছমন কহিল, "হাঁ, কিন্তু ছেলেটি বেশীদিন বাঁচেনি,—ছ'মাসের মধ্যেই মারা গেল।"

"যাক্ মারা গেছে ত!—তবু ভাল।" বলিয়া রামকিষণ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বৌদি' তারপর কি করলে?"

লছমন কহিল, "ছেলেটা মারা যাবার দু'চারদিন পরে বৌদিকে'ও আবার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। তারপর—"

"কেন?—শোকে কোথাও বিবাগী হয়ে গিয়েছিল নাকি!"

"না, বিবাগী হয়ে যাননি, পরে খবর পেলুম যে তিনি নাট-গাঁওয়ে দেবরাজের বাড়ীতে আছেন।"

দেবরাজ রামকিষণদের বাটীতে প্রায়ই যাতায়াত করিত। রামকিষণের স্ত্রীরও তাহার সহিত খুব ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। কিন্তু সন্তান জন্মাইবার পর হইতেই দেবরাজ এ বাটিতে আসা যাওয়া একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। অবশেষে লছমনের উপদেশানুযায়ী রামকিষণের স্ত্রী এখন দেববাজের বাটীতে একরূপ জোর করিয়াই বসবাস করিতেছে।

রামকিষণ কহিল, "যাক্—বেঁচে আছে তাহলে। তারপর আমাদেব জমি জায়গার কি ব্যবস্থা ক'রে এলে?"

লছমন কহিল, "জমি জায়গা ত বিশেষ কিছু ছিল না। দুটো

লাঙ্গল, তিনেটে গরু, একটা মোষ আর ক' বিঘে জমী—এইত মোটে ছিল। তা সেগুলো সব বিক্রি ক'রে দিয়েই এখানে এসেছি।"

রামকিষণ মনে মনে ভাবিল যে তাহার দেশের সম্পত্তি ত একরূপ হস্তান্তরিতই হইয়া গিয়াছিল। এখন যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ ভাবিয়া কহিল, "তা বেশ করেছ।"

সেই সঙ্গে রামকিষণ ভ্রাতার কল্যকার আহারের ব্যবস্থাটা ভাল ক'রিয়া বন্দোবস্ত করিবার মনস্থ করিয়া রাখিল। কারণ যাহার নিকট হইতে কিছু পাইবার আশা থাকে তাহাকে খাতির যত্ন করিবার ইচ্ছাটা মানুষের স্বতঃই আসিয়া থাকে।

লছমন কহিল, "আমাকে যে এইবার একটা চাকরী ক'রে দিতে হবে দাদা।"

রামকিষণ আনন্দের সহিত কহিল, "তার জন্যে কোন ভাবনা নেই। কালই আমাদের কণ্ট্রাক্টর সাহেবকে বলে সব ঠিক ক'রে দেব।"

কথা কহিতে কহিতে রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিল দেখিয়া রামকিষণ কহিল, "তুমিও শ্রান্ত হয়ে পড়েছ, আর আমাকেও চারটে বাজতেই সিগ্‌ন্যাল ঘর খুলতে হবে,—এইবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক্।" বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

(৪)

কণ্ট্রাক্টর সাহেব লছমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকেই কি রামকিষণ পাঠিয়ে দিয়েছে ?"

লছমন কহিল, "আজ্ঞে, হাঁ হুজুর।"

"হুজুর" শুনিয়া কণ্ট্রাক্টর সাহেব আপনাকে আপনই বড় করিয়া গর্ব্বের সহিত দেখিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি রামকিষণকে লছমনের জন্য একটী চাকুরী দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তথাপি বোধ হয় আরো দুই-চারিটী "হুজুর" শুনিবার জন্য তিনি একটু প্যাচ দিয়া কহিলেন," চাকরী দেওয়া এখন ত বড় মুস্কিল বাপু! আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে না হয় একটু চেষ্টা ক'রে দেখতুম।"

লছমন করজোড়ে মিনতি করিয়া জানাইল যে এখানে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকা তাহার পক্ষে কষ্টকর। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট দুই-চারিদিন বসিয়া থাকিয়া খাইতে পারে, কিন্তু বেশীদিন অসম্ভব। তাহারও ত দুই চারিজন পোষ্য আছে।

কণ্ট্রাক্টর সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দেশ থেকে টাকা কড়ি কিছু সঙ্গে আননি ?"

লছমন কহিল, "আজ্ঞে, না হুজুর।"

"সে কি! তোমার দাদা আমায় বল্লে যে দেশের সমস্ত বেচে তুমি টাকা নিয়ে এসেছ ?"

সম্পত্তি-বিক্রয়লব্ধ অর্থের কিয়দংশ পাইবার আশাতেই রামকিষণ ভ্রাতাকে সুনজরে দেখিয়াছিল এবং চাকরীর জন্য বিশেষভাবে চেষ্টাও করিয়াছিল, কিন্তু পরে সমস্ত অবগত হইয়া কহিয়াছিল, "ভাই আমি ছাপোষা লোক,—অন্যত্র ব্যবস্থা কর্‌বার একটা চেষ্টা কর।" লছমন তাই চাকরীর জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। কহিল "হুজুর, আমাকে চাকরী দিতেই হবে।"

কণ্ট্রাক্টর সাহেব কহিলেন, "তোমার কাছে এমন কিছু নেই—যাতে তুমি দুদিন খেতে পার?"

লছমন কোমরের কাপড়, মাথার পাগড়ী প্রভৃতি খুলিয়া দেখাইয়া জানাইল যে, একবেলা খাইবার মত পয়সাও তাহার নাই।

কণ্ট্রাক্টর সাহেব কহিলেন, "দেশে তোমাদের কি কি ছিল?"

"আজ্ঞে, লাঙ্গল, গরু, মোষ, আর কিছু জমি ছিল।"

"সবই ছিল ত বিদেশে ১০।১৫ টাকার চাকরী করতে আসবার কি দরকার ছিল?"

"আজ্ঞে হুজুর, সেখানে পেট ভরে খেতে পেতুম বটে, কিন্তু কাঁচা পয়সা চোখে খুব কমই দেখতে পেতুম।"

কণ্ট্রাক্টর সাহেব মনে-মনে ভাবিলেন—নিরন্নেরা টাকার খোঁজ করে অন্ন সংস্থানের জন্য, কিন্তু এই সব লোক উদর-পূরণে

ও তৃপ্ত হয় না কেন ! কেন তাহারা ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়া সহরে ছুটিয়া আসে পয়সা দিয়া অন্ন কিনিতে।

কণ্ট্রাক্টর সাহেব অর্থের মোহের তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে না পারিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেশ, কাল থেকেই তুমি কাজে লেগো।"

পরদিন ১০৲ টাকা মাহিনার একজন পাথর সরাইবার কুলীর পদে নিয়োজিত হইয়া লছমন কণ্ট্রাক্টর সাহেবকে খুব বড় করিয়া একটা সেলাম জানাইল।

(৮)

রাত্রি আন্দাজ দশটা।

কোম্পানীরই জমিতে একটা পাতার ছাউনী দেওয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া লছমনের স্ত্রী সারাদিন অভুক্ত স্বামীর জন্য ডাল-রুটী সাজাইতেছিল। লছম৹. ততক্ষণ দাওয়ায় বসিয়া শিশু-কন্যা গুলাবীকে কখনও কাঁধে কখনও বা পিঠে লইয়া দিনান্তের শ্রান্তি অপনোদন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ইত্যবসরে নবি সর্দ্দার বাহির হইতে ডাক দিল, "লছমন বাড়ীতে এসেছ ?"

লছমন উৎকর্ণ হইয়া একবার ডাকটা শুনিয়া লইয়া বুঝিল— এ গলা তাহাদের সর্দ্দারের। যে কার্য্যের জন্যই হোক আহার সমাধা না করিয়া লইয়া সে কোন মতেই গৃহের বাহির হইবে না স্থির করিয়া ডাকের কোনরূপ প্রত্যুত্তর দিল না।

তুই চারিবার ডাকিবার পরও কোন জবাব না পাইয়া নবি সর্দ্দার বেড়ার নিকটে আসিয়া ফাঁক দিয়া দেখিয়া কহিল, "কাণে কি কালা হয়েছ? এতক্ষণ ধরে ডাকছি একটা সাড়াও দিতে পার না?"

লছমন গুলাবীকে কোল হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিল, "ওঃ সর্দ্দার।—আমি ভেবেছিলুম আর কেউ হবে।"

"তা যাই ভাব—এখন চল।"

লছমন আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়।"

নবি সর্দ্দার কহিল, "ফুলী নদীর পুলের কাছটা আবার ভেঙ্গে গেছে। আজ রাত্রে না ঠিক করে ফেল্‌লে ভোরের ট্রেণ পাস কর্‌তে পারবে না।"

লছমন কহিল, "আমার যে এখনও খাওয়া হয়নি—সর্দ্দার?"

সর্দ্দার কহিল, "খাওয়ার জন্যে কিছু ভাবতে হবেনা,—কণ্ট্রাক্টর সাহেব সে ব্যবস্থা করে দেবেন।"

মুখের আহার ফেলিয়া রাখিয়া বিনা বাদ-প্রতিবাদে লছমন সর্দ্দারেব পিছনে পিছনে বাহির হইয়া গেল।

ফুলী নদীর পুল লছমনের গৃহ হইতে প্রায় ১৫।১৬ মাইল দূর। লাইন ঠিক করিয়া বসাইতে এবং মেরামতাদি কার্য্যের জন্য তাহাদের তিনদিন কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে কেহই একবেলার জন্যও বাড়ী আসিতে পায় নাই।

মরণোল্লাস

আজ বৈকাল পাঁচটায় কুলী-গাড়ী আসিলে সকলেই বাড়ী ফিরিতে পাইবে ভাবিয়া সকলেই নিজ নিজ যন্ত্রপাতি, কাপড়-চোপড় গুছাইয়া নিকটস্থ ষ্টেশনে উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছে, এমন সময় কণ্ট্রাক্টর সাহেব একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেণ হইতে নামিয়া সর্দ্দারকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমাদের কুলী-ট্রেণ আজ আর আসবে না। আজকের রাতটাও তোমরা এইখানে কাটিয়ে দাও।"

আজ রাত্রিও এইখানে কাটাইতে হইবে শুনিয়া লছমন কণ্ট্রাক্টর সাহেবের নিকটে যাইয়া সেলাম করিয়া কহিল, "হুজুর আজ আমাকে ঘরে ফিরতেই হবে। আমার মেয়ের জন্যে আমার মন বড় খারাপ হয়ে আছে। তাকে না দেখে আমি একদিনও থাকতে পারি না।"

কণ্ট্রাক্টর সাহেব তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে যাইয়া উঠিয়া বসিলেন।

লছমনও আর স্থির থাকিতে পারিল না, তৎপশ্চাৎ ছুটিয়া যাইয়া চলন্ত-গাড়ীর হাতল ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িল।

কণ্ট্রাক্টর সাহেব তাহাকে ধমক দিয়া কহিলেন, "নেমে যাও—নেমে যাও,—এ গাড়ী তোমাদের জন্য নয়।"

লছমন হাতলটা দুই হাতে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "হুজুর, আমি ভেতরে যেতে চাই না,—বাইরে বসেই আমি চলে যাব।"

বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও কথা শুনিল না দেখিয়া কণ্ট্রাক্টর সাহেব তাহাকে ধাক্কা দিয়া কহিলেন, "এ সব বে-আইনী চল্‌তে পারে না। তোমার জন্যে আমারও চাকরী যাবে নাকি!"

লছমন সে ধাক্কা সামলাইতে পারিল না,—ছিট্‌কাইয়া প্লাটফর্মের উপর যাইয়া পড়িল।

তিন মাস পরে ভগ্নপদ লইয়া হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া শুনিল, তাহার চাকরী বরখাস্ত হইয়া গিয়াছে। গৃহের সন্ধানে যাইয়া দেখিল,—কেবল দুই একটা বাঁশের খোঁটা তাহার আবাস-স্থল নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে মাত্র। নিকটস্থ অধিবাসীদিগের নিকট স্ত্রী-কন্যারও কোন সংবাদ পাইল না। অবশেষে ভ্রাতার সন্ধানে বাহির হইয়া খবর পাইল যে সেও কোথায় বদলী হইয়া গিয়াছে! কিন্তু কোন্ স্থানে বদ্‌লী হইয়া গিয়াছে সে কথা কেহই বলিয়া দিতে পারিল না।

লছমন ভাবিল,—এখন উপায়!—খঞ্জকে কে ডাকিয়া চাকুরী দিবে!—কে আর তাহাকে বসাইয়া খাওয়াইবে! দেশের কথা স্মরণ করিয়া তাহার প্রাণটা একবার ব্যাকুল হইয়া উঠিল,—উদরান্নের সেখানে কখনও তো অভাব হইত না!

* * * * *

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

মরণোল্লাস

কাল-বৈশাখী তাহার বৈকালিক রুদ্র-নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে।

সারাদিনের ভিক্ষালব্ধ চাল গুলি আঁচলে বাঁধিয়া লছমন খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ফুলী নদীর ধারে আসিয়া পাক করিবার ব্যবস্থা করিতেছে, এমন সময় নদীর মধ্যস্থল হইতে কাহার যেন আর্ত্তনাদ শোনা গেল,—"বাঁচাও, বাঁচাও।"

লছমন চাহিয়া দেখিল,—একখানা নৌকা উল্টাইয়া ভাসিয়া যাইতেছে এবং তাহারই নিকট হইতে মনুষ্যের আর্ত্ত-স্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

লছমন আর ভাবিবার অবসর পাইল না, চাল গুলি ফুটন্ত জলের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া রাম নাম করিয়া উন্মত্ত তরঙ্গের বুকে ঝাঁপ দিল।

নৌকার সন্নিকটে যাইয়া লছমন বিস্মিত হইয়া দেখিল— তাহাদের সেই পরিচিত কণ্ট্রাক্টর সাহেব নৌকার একপ্রান্ত ধরিয়া চীৎকার করিতেছেন।

কখনও কাঁধে করিয়া, কখনও পা ধরিয়া, কখনও নিজে ডুবিয়া মাথায় করিয়া লছমন কোনক্রমে তাঁহাকে তীরে আনিয়া তুলিল, কিন্তু লছমনের আর উঠিবার সামর্থ্য রহিল না। চির-বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষায় সেই অভুক্ত শীর্ণদেহটা নদীতীরে ধীরে ধীরে ঢলিয়া পড়িল।

কণ্ট্রাক্টর সাহেব সুস্থ হইয়া লছ
নিরীক্ষণ করিয়া অস্ফুটে কহিলেন, "
লছমন!"

নদী-তীরের উন্মত্ত বাতাস লছমনের ফুটন্ত
টগ্‌বগানির সহিত যোগ দিয়া কণ্ট্রাক্টর সাহেবের ক
দিল,--"হাঁ,—সেই বটে!"

সমাপ্ত